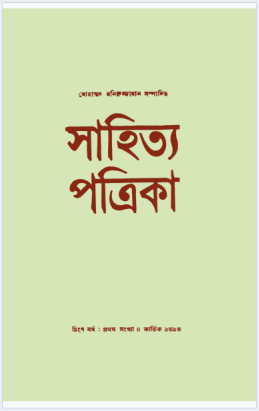

Vol. 30 | No. 1 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আধুনিক আরবী গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ

Volume	30
Issue	1
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ আবু বকর সিদ্দীক
Published online	October 30, 1986
DOI	10.62328/sp.v30i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i1.3
Pages	97-138
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আধুনিক আরবী গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশ

মোঃ আবু বকর সিদ্দীক

আল-নাহ্‌দা বা রেনেসাঁ যুগই আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগ হিসেবে কোন কোন ঐতিহাসিকের কাছে চিহ্নিত এবং ফরাসী বিপ্লবকেই এই যুগের সূচনাকাল বলে তাঁরা ধরেছেন। সাধারণতঃ ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দ হতে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগ বলা হয় এবং ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সময়কে আরবী সাহিত্যের আধুনিক যুগ বলা হয়। মূলতঃ অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দ হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সময়ই হলো আধুনিক আরবী সাহিত্যের যুগ। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী সমর নেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর মিশর ও নিকটপ্রাচ্য আক্রমণের ফলে সমগ্র আরব জগতে এক চেতনা সঞ্চারিত হয়। তা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ফরাসী শক্তি মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিদায় নেবার পর পশ্চিমী দেশসমূহের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের এক সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তখন পশ্চিমী প্রভাবের তেজোদীপ্ত আলোক মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাণবন্যা বইয়ে দেয়। পাশ্চাত্য ভাবধারা সম্বলিত নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে থাকে। এ-প্রসঙ্গে মিশরীয় পণ্ডিত হাসান আল-আররার (মৃ. ১৮৩৪ খ্রী.)-এর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'দার আল-উলূম'-এর নাম করা যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ এখানে সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করতেন। লেবাননের প্রখ্যাত পণ্ডিত বুতরুস আল-বুস্‌তানী (১৮১৯–১৮৮৩) প্রতিষ্ঠিত প্রথম আরবী সাময়িক-পত্রিকা 'আল-জিনান'-এর ভূমিকাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।[১]

সাংস্কৃতিক বিনিময়ও আরবী সাহিত্যে ফলপ্রসূ ক্রিয়া সাধিত করার পক্ষে পরম সহায়ক হয়। মিশরের শাসক খেদীভ মুহাম্মদ আলী

সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি রিফা'আ আল-তাহ্‌তাভী (১৮০০–১৮৭৩)-এর নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক দল ইউরোপে প্রেরণ করেন। পরবর্তী সময়ে এই পণ্ডিত ইউরোপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন রচনা আরবীতে অনুবাদ করে মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করেন। খেদীভ মুহাম্মদ আলী ভেষজ, ফারিগরী ইত্যাদি শিক্ষাসংক্রান্ত অসংখ্য স্কুল-কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খালের উন্মুক্তকরণও মধ্যপ্রাচ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। এই খালের মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সাথে মিশরসহ মধ্যপ্রাচ্যের সকল অঞ্চলেই যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হয়। এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতিও পশ্চিম অঞ্চলের দিকে বিকশিত হতে থাকে। সর্বোপরি প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর পরই মিশর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পীঠস্থানে উন্নীত হয়। মুসলমানদের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ও রেনেসাঁ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই আন্দোলনে আহ্‌মদ লুৎফী আল-সায়্যিদ (১৮৭২-১৯৬৪) সম্পাদিত 'আল-জারীদা' (গেজেট) এবং মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল (১৮৮৮-১৯৫৬) সম্পাদিত 'আল-সিয়াসা' (রাজনীতি) নামক মিশরের পত্রিকা দু'টির ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া ইরাক থেকে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'আল-জাবরা' এবং তারও দুই দশক আগে রাজ্জাক গান্নাম কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'আল-ইরাক' পত্রিকাদ্বয়ের ভূমিকাও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। মূলতঃ বিভিন্ন ভাবধারা ও ঘটনাবলী ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরবী ভাষী লোকদেরকে উত্তেজিত করে তোলে। তারা মিশরের মাধ্যমেও লেবাননের আমেরিকান এবং ফরাসী মিশনারীদের কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে এবং নব্য-ওসমানীয় ও নব্য-তুর্কী আন্দোলনসমূহের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পুনর্জাগরণ এবং প্যান-আরব আদর্শের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে এর ব্যবহার—ষা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উন্নতি লাভ করে—প্রধানতঃ মিশর, লেবানন ও সিরিয়ার খ্রীস্টানদের কার্যাবলীর মাধ্যমে এবং আমেরিকার প্রটেস্টান্ট খ্রীস্টানদের উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর হয়। খ্রীস্টানগণ পাশ্চাত্য ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট

হয়। লেবাননের মেরোনাইদের ব্যাপারে ফরাসী ক্যাথলিকদের ধর্মীয় উৎসাহ এবং আমেরিকার প্রটেস্টান্টদের ধর্মীয় আগ্রহ পাশ্চাত্য সভ্যতার সুফল আনয়ন করে। ধর্মীয় মিশনগুলোর সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রোমান ক্যাথলিকগণ ফরাসী সংস্কৃতি প্রচারে আগ্রহী হলে তারা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। অপরদিকে আমেরিকার প্রটেস্টান্ট-গণ সমস্ত আরবীভাষী লোকদের মধ্যে খ্রীস্টীয়বাণী প্রচারে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করে। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে তারা বৈরুতে প্রথম আরবী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে এবং সমস্ত অগ্রগামী প্রটেস্টান্ট মিশনারীদের ন্যায় তার বাইবেল গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ করে। রেনেসাঁ আন্দোলনের সাহিত্যিকরা প্রধানতঃ দু'টো ধারায় কাজ করতে থাকেন। প্রথমতঃ নতুন চিন্তা ও নতুন পদ্ধতি সাহিত্যে রূপ দেবার চেষ্টায় ব্রতী হন এবং দ্বিতীয়তঃ, অতীতের রচনা এমন কি বিষয়-বস্তুরও সংস্কার সাধন করে সম্পূর্ণ আধুনিক মনোভঙ্গী উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। পাশ্চাত্যের প্রভাবও অবশ্য এই মতাদর্শে অনেকটা সহায়তা করেছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা সে-প্রভাব কাটিয়ে সাহিত্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেন। রেনেঁসা আন্দোলন আরবী সাহিত্যের কাব্য, কথা-সাহিত্য, নাটক প্রভৃতি শাখায় যে চেতনা-সঞ্চারী ক্রিয়া করে, একই ক্রিয়ার লক্ষণ আরবী গবেষণা, প্রবন্ধ কিংবা মননশীল রচনায়ও দৃষ্টিগোচর হয়।[২]

'আল্‌ফ লাইলা ওয়া লাইলা' (এক হাজার এক রজনী)-র সময় কাল থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরবী গদ্য-রীতি একই খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। আল-নাহ্‌দা (রেনেসাঁ) যুগ থেকেই আরবী গদ্যের আধুনিকীকরণ শুরু হয়। এ-প্রসঙ্গে রেজাউল করীমের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

> দু'টো ইউরোপীয় মহাসমর সমগ্র আরব জগৎকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। প্রথম মহাসমর তাকে মুক্ত করলো চারশ বছরের তুর্কী শাসন থেকে, আর দ্বিতীয় মহাসমর তাকে মুক্ত করলো পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে। রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আরব জগতের উপর বইতে লাগল নতুন যুগের হাওয়া। পর পর কয়েকটি বিপর্যয়ের ধাক্কায় সে-দেশ প্রবলভাবে

কেঁপে উঠল। মধ্যযুগীয় জড়তা, ধর্মান্ধতা, রক্ষণশীলতা অপসারিত হতে লাগল। সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেল। এই পরিবর্তন কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, সর্বক্ষেত্রে; শিল্প-সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় একটা বিপুল পরিবর্তন অনুভূত হতে থাকল। আরবী সাহিত্যের প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির পরিবর্তন সাধিত হলো এবং শিল্পী-লেখক ও সমালোচকগণ অসীম সাহসের সঙ্গে নতুনযুগকে অভিনন্দন জানালেন। তাঁরা আর মান্ধাতার আমলের চিরাচরিত পথে চলতে সম্মত হলেন না। তাঁরা যুগের প্রয়োজনের সঙ্গে নিজেদের শিল্প-কৌশলেরও পরিবর্তন করে ফেললেন। অবশ্য সাহিত্যের গতি পরিবর্তন দু'একদিনে হলো না। একশ' বছর ধরে আরবী সাহিত্যের শিল্পী ও লেখকগণ পশ্চিমী দেশের ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। তখন থেকেই আরবী সাহিত্য পশ্চিমী সাহিত্য-রীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। মহাসমরের পর আরবী সাহিত্য রক্ষণশীলতা পরিত্যাগ করে চাঙ্গা হয়ে উঠলো।[১]

নেপোলিয়নের মিশর-অভিযানের পর থেকেই আরবী সাহিত্যের রূপান্তর আরম্ভ হয় এবং এই রূপান্তর আরবী কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। নতুন আঙ্গিকের গদ্য শিল্প-রীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যেমন এগিয়ে আসলেন শিল্পী-সাহিত্যিকরা, তেমনি তাঁদের পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করলো কয়েকটি উন্নতমানের পত্র-পত্রিকা। উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় যাঁরা সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করলেন, তাঁদের মধ্যে সিরিয়ার সালিম আল-বুস্তানী (১৮৪৮-৮৪), মিশরের মুহাম্মদ আবদুহু (মৃ. ১৯০৫), লেবাননের জিবরান খলীল জিবরান (১৮৮৩-১৯৩১), মিশরের মুস্তফা লুৎফী আল-মানফালূতী (১৮৭৬-১৯২৪), সিরিয়ার জুরজী যায়দান (১৮৯১-১৯২৪), লেবাননের সায়ীদ আল-বুস্তানী (১৮৫২-১৯২৭) এবং ইয়াকূব সারুফ (১৮৫২-১৯২৭), সিরিয়ার ফারাহ আনতূন (১৮৭৪-১৯২২), ইরাকের ইব্রাহীম হিলমী আল-উমর (১৮৯৩-১৯৪১) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব কথাশিল্পীদেরকে রেনেসাঁ আন্দোলন বা আধুনিক কথাসাহিত্যের পুরোধা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং তাঁরা সবাই প্রধানতঃ উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। উপন্যাসের টেকনিক, ফর্ম এবং স্টাইল

ইতালী ও ফরাসী ভাষা থেকে গ্রহণ করলেও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এঁরা স্বকীয়তা অর্জন করলেন। ফলে উপন্যাসের সর্বজনীনতার জন্য কিছু সংখ্যক উপন্যাস ইউরোপীয় ভাষা হতে অনূদিত হতে শুরু করলো। সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার এমন নিখুঁত চিত্র আরবী সাহিত্যে ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা যায়নি। এইসব কথাশিল্পীদের সামান্য পরপরই আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যে আর একদল সাহিত্যিকের আবির্ভাব আধুনিক আরবী কথাসাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধির দিকে পৌঁছে দিল। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় কায়রোর মুবা ইলাহী (১৮৭০-১৯৩০), আয়েশা তাইমূর (১৮৪০-১৯০২), মুহাম্মদ তাইমূর (১৮৯২-১৯২১), তাহা হোসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩), তাওফীক আল-হাকীম (১৮৯৮-) মাহমূদ তাইমূর (১৮৯৪-১৯৭৩), ঈসা আবিদ, সাহার্তা আবিদ, তাহির লাশিন, মুহাম্মদ আহমদ, আনোয়ার শাউল, আমীন হাসূনা, আবদুল কাদির আল-মাযিনী (১৮৮৯-১৯৪৯), জাফর আল-খলীলী, আবদ আল-মজীদ লুৎফী প্রমুখের। তাহা হোসাইনকে আধুনিক আরবী সাহিত্যের জনক বলে অভিহিত করা যায়। আরবী গদ্য-রীতির প্রাচীন ধারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়ে তিনি আরবী সাহিত্যে এক নতুন রীতির প্রচলন করলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হলেও স্বকীয়তা ও আধুনিক মনোভঙ্গীসঞ্জাত ধারণা তাঁকে বৈশিষ্ট্যময় করে রেখেছে।[৪]

আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ যুগের সময়ে শিল্প-বিবর্তনের ফলে নতুন ধরনের গদ্যরীতি আরবী সাহিত্যে আশ্রয় নেয়; এ-কারণেই রচিত হতে থাকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের ছোটগল্প, যা ইতিপূর্বে আরবী সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আধুনিকতার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) আরব জগৎকে মুক্ত করেছিল চারশ বছরের তুর্কী শাসনের নাগপাশ থেকে, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) তাকে রেহাই দিয়েছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে। উল্লেখ্য যে, তুর্কীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তারা বিজয়ী ছিল; কিন্তু তারা সংস্কৃতমনা ছিল না, প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল ছিল না। এই রাজনৈতিক মুক্তিই আরব জগৎকে এক নতুন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করে। এই নতুন প্রেরণার সম্যক প্রতিফলন ঘটে আধুনিক আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন

শাখায়। বলতে গেলে স্বাধীনতা লাভের উদগ্র চেতনা থেকেই আরবী নাট্য-সাহিত্যের উন্মেষ।[৫]

ষোড়শ শতাব্দীতে তুর্কীরা মিশর জয় করে। এর পূর্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীতে তারা রোম (গ্রীক) সভ্যতার অবসান ঘটিয়ে কনস্টান্টিনোপল জয় করে। এই অবসান অপেক্ষাকৃত লাভজনক হয়েছিল, গ্রীক সভ্যতার অধিকারী ব্যক্তিগণ ইউরোপে দেশান্তরিত হন এবং আধুনিক সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে তাঁরা কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। ফলে তাঁরা ইউরোপে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার প্রচুর সাহিত্য প্রচার ও প্রকাশ করেন। তবে আরবদের পূর্বাঞ্চলে তাতারদের বিজয় ও স্পেনে পূর্বাঞ্চলীয় খ্রীস্টানদের বিজয়কাল হতে মিশর ও সিরিয়া ইসলামী সভ্যতার লালনভূমি হিসেবে গণ্য হতো। তুর্কীদের বিজয়ের ফলে এ-দুটি দেশের সভ্যতা বিলীন হয়ে গিয়েছে। তাঁরা কলা, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অট্টালিকাগুলো ধ্বংস করেন। তাঁরা মিশর ও সিরিয়ার পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের দেশান্তরের নতুন কোন আবাসভূমিও তৈরী করেন নি। উপরন্তু একদল সাহিত্যিক ও আলেমকে কনস্টান্টিনোপলে দেশান্তর করা হয়। বাকী সকল নিজ নিজ দেশে অজ্ঞাত হয়ে থাকলেন। তাঁরা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে অপারগ হলেন। তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব করা হলো। জীবিকার জন্য কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। এভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান মিশর হতে বিদায় নিচ্ছিল, যদি না আল-আযহার ক্ষীণ আনন্দটুকু অবশিষ্ট থাকত। এমনি এক চরম মুহূর্তে নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নেতৃত্বে ফরাসীগণ ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে মিশর আক্রমণ করেন। তাঁরা মিশরে প্রায় তিন বছর অবস্থান করেন। বিদ্রোহী বাহিনী ও মিশরীয়দের সাথে যুদ্ধ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে এ কয়টি বছর তাঁদের কেটে যায়। নেপোলিয়ন আল-আযহারের পণ্ডিতবর্গ, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের নিয়ে "আল-দাওয়াভীন" নামে যে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেছিলেন তা তাঁর কোন উপকারে আসেনি। আইন সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে, বিশেষ করে, করের ব্যাপারে তিনি এই পরিষদকে আলোচনা ও পর্যালোচনা করার অধিকার দিয়েছিলেন। তবে এই পরিষদ গঠনের গোপন উদ্দেশ্য ছিল তাঁর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থাকে মিশরে সুদৃঢ় করা। মিশরবাসী তাঁর বিরোধিতা করে এবং তাঁর আক্রমণের

বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন পরিচালনা করে। ফলে অনেক লোক রক্ত ও আত্ম-বিসর্জন দেয়। মিশরবাসীদের জাতীয় চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে এবং দেশের প্রশাসন ও তাদের অধিকারসমূহ সম্পর্কে গভীর অনুভূতির ক্ষেত্রে এই দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। যখন তাদের দেশ হতে ফরাসীদের আক্রমণ মূলোৎপাটিত হলো এবং তাঁরা ওসমানী শাসনের স্মরণাপন্ন হলেন তখন তাঁরা নিজেদের একজন নতুন গভর্নর মনোনয়ন করার চিন্তা করলেন। সুতরাং তাঁরা এই উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ আলীকে মনোনীত করলেন এবং ওসমানীয় মহিমান্বিত দরবার (Porte) তাঁকে স্বীকার করে নেয়।[৬]

মিশরীয়রা নেপোলিয়নের এই আক্রমণের ফলে ইউরোপীয় জীবন-পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পেরেছে। মিশরীয়গণ ইউরোপীয় জনগণকে বাস্তব জীবনে এমন কতকগুলো বিষয় গ্রহণ করতে দেখেছে যার সাথে মিশরীয়দের ইতিপূর্বে কোন পরিচয় ছিল না। যেমন খাওয়া ও পান করা, খেলাধুলা, নাটক, গান, বাদ্যযন্ত্র ও নাচ ইত্যাদি।[৭]

মূলতঃ আধুনিক আরবী সাহিত্য কতকগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রাচীন আরবী সাহিত্যের সাথে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কোন মিল নেই। আধুনিক গদ্যে কেবল রূপ ও বাহ্যিক আকৃতিরই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেনি; বরং তার বিষয়বস্তুতেও সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে আধুনিক গদ্য-সাহিত্য পাশ্চাত্যপ্রবণতার অভিনব সাজে সজ্জিত হয়েছে এবং অলংকৃত হয়েছে—আরবী ভাষাকে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। আব্বাসী যুগের পর আরবী সাহিত্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অলৌকিক প্রভাব সূচিত হয়। ফলে এ-সত্যটি প্রমাণিত হয় যে, আরবী ভাষায় মানুষের জীবনের সাথী হবার মত অত্যন্ত শক্তিশালী ভাণ্ডার নিহিত রয়েছে। সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরবগণ অসংখ্য নতুন নতুন গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করে আরবী ভাষাকে উন্নত করেছে। তারা অসংখ্য নতুন নতুন পরিভাষা আবিষ্কার করেছে এবং হাজার হাজার ফরাসী ও ইংরেজী শব্দ আরবী ভাষায় সন্নিবেশিত হয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এশিয়া মহাদেশের উন্নত ভাষাগুলোর মধ্যে আরবী ভাষা অধিক মর্যাদা লাভ করেছে। এই

ভাষায় অতীতের বৃহৎ সঞ্চয় ছাড়াও বর্তমান যুগের ভাষাগুলোর ভাণ্ডারে রূপান্তরিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পূর্বে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এবং সাংবাদিকতার কলাকৌশল আরবী সাহিত্যে ছিল না। আধুনিক যুগ এ-সকল কলাকৌশলের মাধ্যমে আরবীর ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। এখন সাহিত্যের এ-সকল কলাকৌশল আরবী ভাষায় স্থায়ী মর্যাদা লাভ করছে। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমরা ভারত উপমহাদেশে শুধু ইংরেজী হ'তে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করেছি; কিন্তু আরবগণ ফরাসী, ইংরেজী ও গ্রীক ভাষা হ'তে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উপকরণ নিজেদের ভাষায় সংযোজন করেছে।[৮]

নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদ্দীপনার সাথে সাথে আরবদের সাহিত্যে তিনটি উপাদান মৌলিক গুরুত্ব লাভ করেছে। যথা—জাতীয়তা, আরবীয় ও ইসলামিক। ইসলাম তাদে প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ লাভ করেছে। সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী এবং শেখ মুহাম্মদ আবদুহু সব ধরনের সাহিত্য ইসলামের রঙ্গে রঞ্জিত করেছেন। আরব্য ও জাতীয়তা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ধর্ম যার নিদর্শনাবলী, সব সাহিত্যে বিস্তৃতি লাভ করেছে।[৯]

খ্রীস্টানদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতা সর্বপ্রথম লেবাননে অনুপ্রবেশ করে। সেখান থেকে বহু প্রতিনিধি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণের জন্য ইউরোপ গমন করেছে এবং স্বয়ং লেবাননে ভিন্ন দেশীয় শিক্ষা-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সিরিয়া ও লেবানন মিশরের অনেক পূর্ব হতেই পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচয় লাভ করেছে। ১৭০২ সালে আলেপ্পো নগরীতে সর্বপ্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফখরুদ্দীন (১৫৭২-১৬৩৫)-এর শাসনামলে লেবাননের সাথে ইউরোপবাসীদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁর সময় শিক্ষার্জনের জন্য অধিক শিক্ষার্থী ইউরোপের বড় বড় শহরে গমন করে। ফলে, ১৯৬০ সালে লেবাননে ৩৩টি ভিন্নদেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। সেখানে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় পড়ানো হতো। ওসমানী শাসকদের কার্যকলাপের ভয়ে বহু সিরিয়া ও লেবাননবাসী মিশর গমন করে। ফলে নাটক, গল্পলেখা এবং সাংবাদিকতার অগ্রযাত্রায় মিশর বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে।[১০]

১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়ন মিশর আক্রমণ করেন। এ-সময় মিশর তুরস্কের শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু তথাকার সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকাশ তমসাচ্ছন্ন ছিল। তুর্কী ও সাধারণ অধিবাসীদের শব্দসমূহের সংমিশ্রণ ভাষার মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি করেছে। কাব্য-গ্রন্থসমূহ জটিলতা, অলংকার ও শাব্দিক যাদুতে পরিপূর্ণ ছিল। কাব্যচর্চা সম্পূর্ণ নির্জীব হয়ে গিয়েছিল। রচনাশৈলী ছন্দোবদ্ধ গদ্যের মাপকাঠির শিকারে পরিণত হয়েছিল। এ-সময় নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণ যথোপযোগী হয়েছিল। তিনি জীবনের তন্ত্রীতে প্রাণ-সঞ্চার করেন। আরবগণ অনেক কষ্টে নিজেদের ভাষার ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুভব করে। ফরাসীগণ মিশরে সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করে। সুতরাং তারা সেখানে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করে এবং মুদ্রণপ্রথা চালু করে। এসব বস্তু মিশর-বাসীদের নিকট নতুন ছিল। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্যবাসীগণ মিশরবাসীদের চেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী ছিল।[১১]

নেপোলিয়ন তাঁর সাথে এমন একদল বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসেছিলেন যারা ইতিহাস, অংক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিল। মিশরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ন "মিশরীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান" নামে একটি মজলিস প্রতিষ্ঠা করেন ; যা ফরাসী বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ ছিল। মিশরের বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে অবহিত করানোই ছিল এ-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। এ-সকল বিশেষজ্ঞ মিশরের ব্যাপারে সঠিক পর্যালোচনার জন্যে দেশের আনাচে-কানাচে নক্ষত্রের ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ-প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মিশরের অসাধারণ উপকার সাধন করেছে। মিশরের পুরাতন সভ্যতার নিদর্শনাবলীকে আধুনিকতার সঠিক আলো দান করেছে। ফরাসী বিশেষজ্ঞদের পরিশ্রমের ফল হিসেবে মিশরের বর্ণনা দিয়ে Description D' Egypt নামে নয় খণ্ডে একটি বই ১৮০৯ সাল হ'তে ১৮২৩ সালের মধ্যে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। আধুনিক মিশর সম্পর্কে যে-সকল তথ্য ইউরোপে জানা গিয়েছিল, এ-পুস্তকে তার মৌলিক তথ্য রয়েছে।[১২]

নেপোলিয়ন মিশরে প্রায় তিন বছর অবস্থান করেন। এ-সময় মিশরবাসী এই সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত যুদ্ধে

লিপ্ত থাকে। সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে মিশরবাসীদের অন্তরে বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং সংশোধনের প্রবল ইচ্ছা তাদের মনে ঢেউ তোলে। মিশরবাসীদেরকে শান্ত করার জন্য নেপোলিয়ন "আল-দাওয়াভীন" নামে একটি পরামর্শ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী ছাড়াও আল-আযহারের নয় জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে পরিষদ গঠন করা হয়। অবশেষে কিছুকাল পর মিশরবাসীদের জন্য সরকারী কাজকর্মে অনুপ্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হয়।[১৩]

ফরাসীগণ দু'টি পত্রিকা বের করেন। এ-দু'টি পত্রিকা প্রকৃতপক্ষে ফরাসী ভাষারই সেবা করেছে। পত্রিকার একটি হ'লো—"বারীদ মিশর" বা La Courrier de L, Egypt (মিশরীয় ডাক); এতে মিশরের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যেত এবং দেশের বিভিন্ন সমস্যার ওপর আলোকপাত করা হতো। দ্বিতীয় পত্রিকাটি ছিল—"আল উশারা" বা La di'cade Egyptienne-এর মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা পর্যালোচনা করা হতো। দু'টি পত্রিকাই ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হতো।[১৪]

ফরাসীগণ একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে উৎকৃষ্ট মানের নাটক প্রদর্শন করা হতো। তারা মিশরে দু'টি আধুনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ফরাসী মেয়েদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করেছিল। যতদূর আধুনিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক রয়েছে, মিশরের অনেক পূর্বেই বৈরুতে ইউরোপীয় ভাষায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। এতে মিশরের এই উপকার হলো যে, যখন তুর্কী সরকারের অত্যাচারে জনগণ ভীত হতো তখন তারা বৈরুত ও সিরিয়া হ'তে মিশর গমন করতো। মিশরে তখন আরবদের প্রশাসন মুহাম্মদ আলী ও পরে ইসমাইলের হাতে ছিল। মুহাম্মদ আলী তুর্কী ছিলেন না, বরং আলবানীয়ান ছিলেন। তবে তিনি এবং তাঁর পরিবারের লোক তুর্কী রূপ ধারণ করেছিলো।[১৫]

ফরাসীগণ মিশরে খুব বড় একটি লাইব্রেরী স্থাপন করে। নব্য-ইউরোপের অগণিত পুস্তক ছাড়াও এ-লাইব্রেরীতে দুষ্প্রাপ্য আরবী গ্রন্থাবলী এবং পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। ফরাসীগণ অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে মাদ্রাসা, মসজিদ ও গীর্জাসমূহ হ'তে আরবী ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি ও শিলালিপিগুলো সংরক্ষণ করেছিল। যাঁরা এ-লাইব্রেরী হ'তে

উপকৃত হবার ইচ্ছা পোষণ করতেন তাঁরা আনন্দের সাথে অনুমতি পেতেন।[১৬]

যখন নেপোলিয়নের প্রভাব শেষ হলো এবং ফরাসীগণ মিশর ত্যাগ করলো, তখন মিশরবাসী মুহাম্মদ আলীকে মিশরের শাসক (গভর্নর) নিযুক্ত করল এবং আঙ্কারার উচ্চ পদস্থ কর্মচারীবৃন্দও (অর্থাৎ দরবার) এতে সম্মতি জানালো। মুহাম্মদ আলী মিশরের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন; ফলে তাঁকে ইউরোপের সামরিক মান অবলম্বন করতে হয় এবং ফ্রান্সের নিকট তিনি এ-ব্যাপারে সাহায্য কামনা করেন। এটা ফরাসী ভাষা শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব ছিল না। সুতরাং তিনি উন্নতমানের আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্র তৈরী করেন। এ-সকল শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকগণ সকলেই ফরাসী ছিলেন। মুহাম্মদ আলী ছাত্র-শিক্ষকের একদল প্রতিনিধি ফ্রান্সে পাঠান। তাঁরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের শিক্ষা নিয়ে মিশরে ফিরে আসেন। ভবিষ্যতে এ-প্রতিনিধিদল মিশর ও ইউরোপের মাঝে জ্ঞানসমন্বয়ের সত্যিকার বাহন হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা অগণিত আধুনিক সাহিত্যের দ্বারা আরবী সাহিত্যকে প্রাচুর্য দান করেন। অনুবাদের মাধ্যমে তাঁরা অগণিত নতুন নতুন পরিভাষা সৃষ্টি করেন।[১৭]

এই দলের মধ্যে রিফা'আ আল-তাহতাভী, আলী মুবারক ও মাহমুদ আল-ফালকী যথেষ্ট সেবা করে গেছেন। রিফা'আর পরামর্শে মোহাম্মদ আলী পাশা "মাদ্রাসাত আল-আলসুন" নামে একটি ভাষা-প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তিনি এক হাজারেরও বেশী বই ইউরোপীয় ভাষা হ'তে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। ফ্রান্সের সংবিধান আরবীতে অনুবাদ করা হয়। ফরাসী কবিদের লেখাও আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছে। মোহাম্মদ আলী পাশা "আল-মাতবা'আতু আল-আমীরিয়্যা" নামে প্রসিদ্ধ ছাপাখানা স্থাপন করেন। এ-ছাপাখানা হ'তে উল্লেখযোগ্য পত্রিকা "আল-ওয়াকায়ে আল-মিসরীয়্যা" প্রকাশিত হ'তে থাকে।

মোহাম্মদ আলীর পর তাঁর ছেলে আব্বাস পাশা রাজত্বের অধিকারী হন। তিনি উল্লেখযোগ্য কোন কার্যসাধন করেননি। তবে যখন ইসমাইল পাশা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি একটি নতুন বৈজ্ঞানিক জীবনের সূচনা করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর রুচি মোহাম্মদ

আলীর চেয়ে উন্নতমানের ছিল। তিনি সমগ্র ইউরোপের উন্নতিকে কুড়িয়ে নেয়ার সংকল্প করেছিলেন। তিনি ১৭২ জনের একটি প্রতিনিধি দলকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ফ্রান্স পাঠিয়েছিলেন। তাই ইসমাইলের শাসনামলে স্কুল, কলেজ, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের সংখ্যা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ফলে, কয়েক বছরের মধ্যে দেশের শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

ইউরোপ হ'তে অনেক লোক এসে ব্যবসায়ী-কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে এবং নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) সমূহ তৈরী করে। ইসমাইলের সময় "দারুল উব্‌রা" ও "আল-মাক্‌তাবাতুল খেদিভীয়্যা" প্রতিষ্ঠা করা হয়। মোহাম্মদ আলী যা কিছু করেছিলেন তা সামরিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল ; কিন্তু ইসমাইল বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক মানকে উন্নত করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ইসমাইল পাশার যুগে মিশরের প্রখ্যাত নীল নদ খনন করা হয়। এ-নদী ইউরোপ ও আরবদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এক অভিনব ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করছে। নীল নদের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যেকার দূরত্ব বহুলাংশে কমে যায় এবং এ-দু'দেশের অধিবাসীগণ পরস্পর নিকটবর্তী হবার সুযোগ পায়। এই প্রাকৃতিক নৈকট্য থেকে আত্মার নৈকট্য সহজতর হয়। আরবগণ ইউরোপবাসীদের থেকে সম্পূর্ণ উপকার লাভ করেছে। তাদের চিন্তাশক্তি ও সভ্যতার ওপর ইউরোপবাসীদের দীর্ঘ শাসনের প্রতিফলন ঘটে। তাছাড়া, মিশরের ইতিহাসে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইউরোপবাসীগণ দলে দলে মিশরে আসতে থাকে এবং অনুরূপভাবে মিশরবাসীগণ ইউরোপ ভ্রমণ করতে থাকে।

এসব ঘটনাবলী মিশরে জাতীয় স্বাধীনতা ও স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম দেয়। পক্ষান্তরে মিশরে ইংরেজদের অনুপ্রবেশের পর থেকে জাতীয় আন্দোলন পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এসব ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা অধুনিক আরবী সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত হয়।[১৮]

মিশরকে কেন্দ্র করে ফরাসী ও ইংরেজদের পারস্পরিক শক্তির পরীক্ষা চলতে থাকে—যা সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওপর পূর্ণ প্রভাব বিস্তার

করে। ফরাসী ভাষা ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক ও শিক্ষাজীবনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। নোপোলিয়ন বলেছিলেন, ফরাসী ভাষা শিক্ষালাভ কর; কেননা এর দ্বারা মাতৃভূমির সেবা করা হয়। ফলে অসংখ্য স্কুল ও কলেজে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। সমস্ত কাজকর্ম ও অফিস-আদালতে ফরাসী ভাষা প্রচলিত ছিল। ফরাসীগণ তাদের ভাষার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবে--তা কিছুতেই মানতে পারেনি। অন্যদিকে লর্ড ক্রমার মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেই অনুভব করলেন যে, সর্বপ্রথম ফরাসী প্রভাব শেষ করে ইংরেজী ভাষার প্রভাব বিস্তার করা প্রয়োজন। অন্যথায়, সম্পূর্ণরূপে ইংরেজীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। সুতরাং তিনি সর্ব-প্রথম শিক্ষাপ্রতিনিধি ইউরোপে, বিশেষকরে, ফ্রান্সে পাঠানো বন্ধ করলেন; কেননা এর দ্বারা মিশরে জাতীয় চেতনার ব্যাপক উন্মেষ ঘটেছিল। তারপর তিনি শিক্ষার মাধ্যম ফরাসী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা করলেন। ফলে, সাধারণ ছাত্রদের অনেককে জটিলতার সম্মুখীন হ'তে হয়। এরপর প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজী ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। রাষ্ট্রের প্রতিটি চাকুরীর জন্যে ইংরেজী জানা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এসব পদক্ষেপের ফলে ফরাসী ভাষার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে একটি চুক্তি হলো যে, মিশরে যে সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সর্বপ্রথম ফরাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলো বহাল রাখা হবে। এর ওপর ভিত্তি করে ছাত্র-সমাজ ফরাসী ভাষা শিখতে থাকে এবং ব্যবসা-জগতে এ-ভাষা বহাল থেকে যায়।[১৯]

সরল ও প্রাঞ্জল ভাষার আন্দোলন

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় আরবগণ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করল যে, এ-পর্যন্ত যে ছন্দোবদ্ধ ভাষা প্রচলিত ছিল তা জীবনের সাথী হতে অপারগ ছিল। যে ভাবে চিন্তা-ভাবনায় স্বাধীনতা সৃষ্টি হচ্ছিল ঠিক সেভাবে ভাষায় ও বর্ণনায় স্বাধীনতার উপাদানগুলোও অনুপ্রবেশ লাভ করে। মুহাম্মদ আলী ও ইসমাইলের সময় রিফা'আ আল-তাহ্‌তাভী এবং তার সাথীগণ "ভাষা প্রতিষ্ঠানে" (মাদ্রাসাত-আল-আলসুন) ফরাসী সাহিত্যের অনেক অনুবাদ ছন্দোবদ্ধ ভাষায় করেছিলেন বলে তাদেরকে সাধারণ জনগণ পছন্দ করতনা। তাঁদের মর্যাদা বর্তমানে

শুধু ঐতিহাসিক হিসেবে রয়ে গেছে। ঐ ভাষা জনগণকে সরাসরি আকর্ষণ করতো না; বরং পাঠক এবং ঐ ছন্দোবদ্ধ ভাষার মধ্যে ভারী পর্দা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে।

পাশ্চাত্যের প্রভাব ছাড়াও আরবগণ যখন আবুল ফরজ আল-ইস্ফাহানী, ইবন আল-মুকাফ্ফা ও ইব্ন খালদুনের ভাষা ও লেখার পদ্ধতি দেখতে পেল, তখন তাঁদের ধারণা হলো যে, এসব লেখকের লেখায় সরল ও প্রাঞ্জলতা প্রথমেই ছিল এবং এই কৃত্রিম ভাষা পরে সৃষ্টি হয়। তাঁরা কৃত্রিম পদ্ধতির বর্ণনা পরিত্যাগ করে সরল ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। ফলে দু'টি লেখক দলের সৃষ্টি হয়। একদল হলো—আল-মুহাফেজুন (রক্ষণশীল)—যারা পুরাতন পদ্ধতির সংরক্ষণ করতো। অন্যদল হলো—আল-মুতাহেরিররুন (স্বাধীন চিন্তাশীল)—যারা কোন বর্ণনার অনুসরণকে স্বীকার করতো না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিপুল সংখ্যক সিরীয় ও লেবাননী মিশরে আগমন করে। তারা ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করে এবং অসংখ্য পুস্তক আরবীতে অনুবাদ করে। ফলে আরবী ভাষা বহুলাংশে সমৃদ্ধি লাভ করে। এ-যুগে অন্যান্য ভাষা হতেও আরবীতে অসংখ্য অনুবাদের কাজ হয়। বিশেষ করে—উপন্যাস, গল্প ও নাটকের ক্ষেত্রে অনুবাদের অন্ত ছিলনা।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাধারণের ভাষাকে বক্তব্য পেশের বাহন করার আন্দোলন শুরু হয়। মুহাম্মদ ওসমান জালাল এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। প্রাচ্য ভাষাবিদ্‌গণ এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ফলে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে এই চেতনা জাগলো যে, পুরাতন সাহিত্য ও কোরআনের ভাষা থেকে আরবদের সম্পর্ক যেন ছিন্ন না হয়। এজন্য স্থানীয় আরবী ভাষাকে মূল ভাষা হিসেবে গণ্য করা এবং শুদ্ধ ভাষাকে রহিত করার আন্দোলন সফল হয়নি।

সাংবাদিকতার ক্রমবর্ধমান উন্নতি আরবী ভাষাকে স্বাধীন, সরল ও সাবলীল করেছে। মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ চিন্তাধারা সহজ ও সরল ভাষায় অবতারণা করতে আরম্ভ করে।

সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকা ছাড়াও অনেক লেখক ও সাহিত্যিক সরল ভাষায় বহু পুস্তক লিখেছিলেন এবং বিদেশী ভাষা হ'তে ছন্দবিহীন পদ্ধতিতে অনুবাদ করেছেন। এদের মধ্যে প্রখ্যাত লেখক ও গ্রন্থকার জুরজী যায়দানের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি আনুমানিক ২০ খানা উপন্যাস লিখেছিলেন। উপন্যাসগুলোর বিষয়বস্তু ইসলামের ইতিহাস থেকে নিয়েছিলেন। আরবী ভাষায় তিনি ৯ খণ্ডে আরবী সাহিত্যের ইতিহাস এবং ৪ খণ্ডে ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস লিখেছেন।

বর্তমানে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার ন্যায় আধুনিক আরবী ভাষাও সরল এবং প্রাঞ্জলতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বহন করছে।[২০]

ছাপাখানার প্রবর্তন

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপবাসীদের নিকট ছাপাখানা অজানা ছিল না। তারা আরবী পুস্তকগুলো নিজেদের ছাপাখানায় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করে। তাদের দেখাদেখি তুর্কীগণ সপ্তদশ শতাব্দীতে ছাপাখানা প্রচলন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিরিয়ার ছাপাখানাগুলোতে পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু মিসরবাসীগণ তখনো ছাপাখানার ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিল। নেপোলিয়নের আক্রমণের ফলে মিশরে ছাপাখানার প্রবর্তন হয়। পরবর্তী-পর্যায়ে মুহাম্মদ আলী আলেকজান্দ্রিয়ায় "বোলাক" নামক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলো ছাপাখানার প্রয়োজনকে জীবনের প্রয়োজনীয়তার ন্যায় অত্যাবশ্যক করে দেয়। এজন্য দেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাময়িকী ছাড়াও আরবী ভাষায় পুরাতন ও নতুন পুস্তকগুলো ব্যাপকহারে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পুস্তকগুলো আরবদের চক্ষু খুলে দিল এবং তারা জানতে পারল যে, সরল ও সহজ ভাষায় লেখা শুধু পাশ্চাত্যবাসীদের বৈশিষ্ট্য ছিল না; বরং হাজার হাজার বছর পূর্বে আরবদের মধ্যে ইবন আল-মুকাফ্ফা, জাহিয ও ইব্ন খালদূনের ন্যায় অনেকেই ছন্দোবদ্ধ ও মিত্রাক্ষর ছাড়া সহজ-সরল, পরিষ্কার, মনমাতানো ও সাবলীল ভাষায় লিখতো। অনুরূপভাবে কবিতার ক্ষেত্রেও তাদের উৎকৃষ্ট মাপকাঠির ভাষা দৃষ্ট হয়, যা ছাপাখানারই অবদান। আরবদের নিকট ইউরোপ হ'তে প্রাচ্য ভাষাবিদ্‌দের লিখিত বই আসতো এবং পাশ্চাত্য

চিন্তাশক্তি স্বয়ং আরবদের মাঝে পুরাতন সাহিত্যকে জীবিত করার প্রেরণা যোগাত। ফলে, আব্বাসী যুগের কবি ও সাহিত্যিকদের গ্রন্থসমূহ ব্যাপকহারে ছাপানো হয়, যা এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, চিন্তার জগতে ছাপাখানাগুলো আরবদের জাগরণ এবং তাদের পুরাতন সাহিত্যের পুনর্জাগরণের ব্যাপারে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব ছাপাখানার প্রভাবে সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোর ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বিভিন্ন ধরনের লাইব্রেরী আত্মপ্রকাশ করে। এদের মধ্যে "দারআল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলী মোবারক ১৮৭০ সালে এই লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা করেন। এতে বিপুল পরিমাণ পাণ্ডুলিপির সমাহার ঘটেছে। এর মধ্যে বিদেশী ভাষায় রচিত অনেক বইও রয়েছে। এই লাইব্রেরী হ'তে উপকৃত হবার জন্য দেশ-বিদেশ হ'তে বিদ্বান ব্যক্তিদের ক্রমাগত আগমন অব্যাহত থাকে।

খেদীভ ইসমাইলের শাসনামলে বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশনার কাজ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে যায়। এসব পুস্তক-পুস্তিকা বিক্রির জন্য অসংখ্য দোকান-পাট খোলা হয়। বিদেশী বই-এর অনুবাদ ব্যাপকহারে প্রকাশ করা হয় এবং এইসব বই-এর দ্বারা বাজার পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এভাবে ছাপাখানাগুলো আরবদের অসাধারণ উপকার সাধন করে। বর্তমানে আরব দেশগুলো পরস্পর একে অন্যের চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করছে এবং নিজেদের পুরাতন সাহিত্য-পুঁজির শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করছে, যার ওপর গবেষণা করতে গিয়ে ইউরোপবাসীগণ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিচ্ছে।[২১]

সাংবাদিকতার ক্রমোন্নতি

প্রাচ্যের অনেক পূর্বে পাশ্চাত্যে সাংবাদিকতার ব্যাপক উন্নতি হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের জনগণের প্রশাসন-বিরুদ্ধ অভিযোগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশ করা হতো। ফ্রান্সে স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে যে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়, তাতে সংবাদপত্রের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

ফরাসী আক্রমণের উত্তরকালে মিশরে ফরাসীগণ নিজেদের ভাষায় দুটি সংবাদপত্র চালু করে। ইতিপূর্বে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা দুটি জনগণের ওপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। পরবর্তী পর্যায়ে মুহাম্মদ আলী "জার্নাল আল-খেদীভী" প্রকাশ করেন; উহা ১৮২৮ সালে "আল ওয়াকায়ে আল-মিশরিয়্যা" নামে প্রকাশিত হয়। প্রথমে সাময়িকীটি আরবী ও তুর্কী ভাষায় প্রকাশিত হতো। পরে রিফা'আ আল-তাহ্‌তাভী যখন এর সম্পাদক নিযুক্ত হন তখন হ'তে তিনি শুধু আরবীতে এটা প্রকাশ করতে থাকেন। এ-সাময়িকীতে সরকারের ধ্যান-ধারণা ও রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটতো। ইসমাইলের শাসনামলে আলী মোবারক "রওদাত আল-মাদারেস" নামে অন্য একটি গবেষণা পত্রিকা (রিসালা) প্রকাশ করেন। এর মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রবন্ধ ছাপা হতো এবং পরিভাষার গঠন-প্রণালীর ওপর আলোকপাত করা হতো। এ-সময় ইয়াকুব সানূ "আবু নাজারা" নামক একটি রাজনৈতিক সাময়িকী প্রকাশ করেন।

এ-সময় সিরিয়া ও লেবানন হ'তে কিছু লেখক তথাকার রাজনৈতিক অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্যে পালিয়ে মিশরে আশ্রয় নেন এবং আরবী সাংবাদিকতার উন্নতির ব্যাপারে তাঁরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেন। সাহিত্যিক ইসহাক "মিশর" নামে একটি গবেষণা পত্রিকা (রিসালা) প্রকাশ করেন। এ-সকল বিদ্বান ব্যক্তি "আল-আহ্‌রাম" এবং "আল-মাকতাম" নামক গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। এসব পত্রিকাতে মাতৃভূমির স্বাধীনতার অনুভূতির প্রতি উদাত্ত আহবান প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু যখনই মিশরের ওপর ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে তখন সকল স্বাধীনতার প্রাণ হরণ করে নেয়া হয়। কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর স্বাধীনতা লাভের অনুপ্রেরণা আপনা থেকেই জেগে উঠলো যা সাংবাদিকতার এক ব্যাপক ও নবযুগের সূচনা করলো। অনেক নতুন নতুন সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। শেখ আলী ইউসুফ "আল-মুয়ায়্যেদ" বের করলেন। আব্দুল্লাহ নাদীম "আল-উসতায" প্রকাশ করলেন। মুস্তফা কামিল "আল-লিওয়া" প্রচার করলেন। ইংরেজদের অসন্তোষ সত্ত্বেও এসব সংবাদপত্র চালু ছিল। আরবদের মধ্যে নব-জাগরণ ও দেশপ্রেমের বাসনা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। একদল "হিযবুল

উম্মৎ" নামে প্রতিষ্ঠিত হন, যাঁরা নিজেদের পত্রিকা "আল-জারীদা" নামে প্রকাশ করেন।

সে যাই হোক, মিশর হতে ইংরেজদের বিদায় নেয়ার সাথে সাথে সেখানে পার্লামেন্টারী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজনৈতিক দলসমূহের আবির্ভাব ঘটে এবং সাথে সাথে সাংবাদিকতায় উৎফুল্লতার ভাব সৃষ্টি হয়। ফলে সংবাদপত্র ও গবেষণা পত্রিকাসমূহ ব্যাপকহারে প্রকাশিত হ'তে থাকে। অন্যান্য পত্রিকা ছাড়াও সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ব্যাপকহারে প্রকাশিত হতে থাকে। এদের মধ্যে "আল-মুকতাতাফ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। অনুরূপভাবে সাহিত্য পত্রিকা "আল-হেলাল" সাহিত্যের যথেষ্ট সেবা করেছে, সাপ্তাহিক "আল-সিয়াসা" এবং "আল বালাগা" বিশিষ্ট গবেষণা পত্রিকা ছিল। "আল-কাতিব আল মিশরী", "আল কিতাব", "আল রিসালা" এবং "আল সাকাফা" অসাধারণ প্রভাবসম্পন্ন গবেষণা পত্রিকা আরবী সাংবাদিকতার দিগন্তে উদীয়মান নক্ষত্রের ন্যায় ছিল। এসব সংবাদপত্র ও রিসালার মধ্যে রাজ-নৈতিক, সাহিত্যিক, সমালোচনামূলক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হতো। এর মধ্যে এমন অনেক নতুন নতুন ভিন্ন-ধর্মী বিষয়বস্তুর ওপর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো যার পুরাতন সাহিত্যের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। পুরাতন সাহিত্যের সকল ভাণ্ডার অধিকাংশ শাব্দিক যাদু খেলার ওপর নির্ভরশীল ছিল ; কিন্তু আরবী সাংবাদিকতা এই দৈন্য ও শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করে তার মধ্যে জীবনের বিষয়-সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে মানবীয় অনুভূতি ও উদ্দীপনা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা প্রাণবন্ত করে তোলে। নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য সংবাদপত্র ও সাহিত্যের ফলশ্রুতি হিসেবে আরবদের এসকল পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়। সাংবাদিকতার মাধ্যমে সাংবাদিকরা বিদ্বান ও শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তে সাধারণ লোকদের প্রতি আহ্বান জানান। জনগণের উদ্দীপনায় সাহিত্যকে বিভিন্ন রূপে রূপায়িত করে এবং সাথে সাথে তারা ছন্দহীন সরল ভাষাও ব্যবহার করেন। এভাবে আরবী ভাষা তার নিজস্ব অঙ্গনে সব বিষয় সংগ্রহ ও সংমিশ্রন করে যথাযোগ্য অধিকার লাভ করেছে। এমতাবস্থায় আরবী ভাষা জনগণের অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার মুখপত্র হিসেবে গণ্য হলো। ধর্মীয় সংস্কারের বিষয়সমূহ এবং সামাজিক জটিলতার

আলোচনা ছন্দবিহীন আরবী ভাষায় সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনগুলোতে ছাপতে থাকে। এভাবে বিদ্বান ও সাহিত্যিকগণ জনগণের ভাষার নিকটবর্তী হন। তদুপরি একদল লেখক নিজেদের উচ্চ মনোভাব, রঙগীন কল্পনা ও সজ্জিত পদ্ধতি বর্ণনার জন্য আলাদা দল হিসেবে পরিগণিত হন, সে যাই হোক, নতুন যুগের বায়ু-প্রবাহের সাথে প্রভাবান্বিত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। নতুন চিন্তা-ভাবনা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে প্রভাবান্বিত করে এবং আরবী সাংবাদিকতা, চিন্তা-ধারা, সাহিত্য ও সামাজিকতার ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে।[২২]

প্রবন্ধ লেখা

আধুনিক যুগের পূর্বে প্রবন্ধ-লেখার কলাকৌশল আরবদের জানা ছিল না। তারা দীর্ঘ প্রবন্ধ (মাকাল) লিখতো। এগুলোকে "রিসালা" (গবেষণা পত্রিকা, চিঠিপত্র, গবেষণামূলক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ) নামকরণ করা হতো। যেমন, জাহিযের দীর্ঘ প্রবন্ধগুলোকে "রাসাইল আল-জাহিয" বলা হতো। এ-পদ্ধতিও আরবদের নিজস্ব ছিল না; বরং এটা গ্রীক ও প্যারস্যবাসীদের থেকে ধার করা ছিল। আধুনিক আরবগণ প্রবন্ধ লেখার নমুনা পাশ্চাত্যদের থেকে নিয়েছে। মূলতঃ রিসালা ও মাকালার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো—রিসালা দীর্ঘ হওয়া ছাড়াও এর মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করা হয় এবং এর শ্রোতাগণ বিদ্বান ব্যক্তিদেরই অন্তর্গত। পক্ষান্তরে, মাকালার উদ্দেশ্য ভিন্ন ধরনের। প্রবন্ধ লেখকের সম্মুখে সাধারণ লোকের উদ্দেশ্য ও আকাঙক্ষা উপস্থাপিত হয় এবং সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়। এ-জন্য এর ভাষা তুলনামূলকভাবে সহজ ও সাধারণের বোধগম্য ছিল। এর মধ্যে গভীর চিন্তার অবতারণার পরিবর্তে সাধারণতঃ স্বাভাবিক সরলতা ও সৌন্দর্য বিদ্যমান ছিল। ফলে প্রবন্ধলেখা সাংবাদিকতার অগ্রগতিকে আরো উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়।

প্রবন্ধলেখা মিশরে অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে, যার নিদর্শন সামাজিক পরিষদে রূপ লাভ করে। সুতরাং এসব প্রবন্ধের প্রভাব আরবী পালার বিদ্রোহের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানীর রাজনৈতিক, আব্দুল্লাহ

নাদীমের উত্তেজনাপূর্ণ এবং মুহাম্মদ আবদুহর সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-সমূহ সৃষ্টি করেছে। তাঁরা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন এনেছেন। এ-জন্য জামালুদ্দীন আফগানীকে মিশর ত্যাগ করতে হয়েছে। মুহাম্মদ আবদুহকে দেশান্তর করা হয় এবং আবদুল্লাহ নাদীম আত্ম-গোপন করতে বাধ্য হন। নাদীমের প্রবন্ধগুলোতে সম্বোধন ও স্বদেশী অনুপ্রেরণার এক উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত। এর মধ্যে যেমন রয়েছে ব্যঙ্গ, তেমনি আবার আনন্দও। সঙ্গে সঙ্গে এরা বিদ্রোহ ও স্বাধীনতার জীবাণুও বহন করে। এতে সংস্কারের ভাবও অনুভূত হয়। শেখ মুহাম্মদ আবদুহর প্রবন্ধগুলোতে সম্বোধন কম; কিন্তু ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে ধর্মীয় সংস্কার, ইসলামের সামাজিক সমস্যাসমূহ ও স্বাধীনতার আহ্বান প্রকাশ পেয়েছে।

এই স্তরের পর আবার মুস্তফা কামিল, শেখ আলী ইউসুফ এবং লুৎফী আল-সায়্যিদ প্রমুখ লেখকদের প্রবন্ধ সামনে আসে। মুস্তফা কামিল "জারীদা" ও "আল-লিওয়া" নামক সাময়িকীগুলোতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রবন্ধ অধিক পরিমাণে লিখেছেন। তাঁদের প্রবন্ধ-গুলো স্বাধীনতার বাণী বহন করতো। শেখ আলী ইউসুফ "আল মুআয়্যাদ" নামক রিসালায় ইসলাম ও প্রাচ্যের প্রতিরোধের পক্ষে খুব জোরালো প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও মাতৃভূমির অনু-প্রেরণা দ্বারা প্রবন্ধগুলোতে নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। লুৎফী আল-সায়্যিদ জাতীয় সংস্কারমূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে ঘুমন্ত আরব জাতিকে জাগ্রত করতে সফল চেষ্টা করেন। এ-সকল দলের মধ্যে মুস্তফা লুৎফী আল-মানফালুতীর নাম প্রণিধানযোগ্য। তিনি বিশেষ রচনাশৈলীর দ্বারা তাঁর প্রবন্ধকে অন্যান্য প্রবন্ধ থেকে বৈশিষ্ট্যময় করে তোলেন। তাঁর "আল-নাযিরাত" প্রবন্ধ খানা পাশ্চাত্য ধারায় প্রবন্ধ-লেখার সকল গুণাবলীর দাবীদার। মোদ্দাকথা মানফালুতীর প্রবন্ধে দারিদ্র্য, আমিরী, সামাজিক অনুভূতি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুন্দর দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

এর পরবর্তী যুগে দুজন অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধলেখক আরবী সাহিত্যে আবির্ভূত হন। যাঁদের প্রবন্ধ বিজ্ঞান ও সাহিত্য, চিন্তা ও তত্ত্বকে দীপ্তিমান করেছে এবং চিন্তার দিগন্তকে উদীয়মান করেছে, তাঁরা হলেন---আহমদ আমীন এবং মুস্তফা সাদিক আল-রাফি'য়ী। আহমদ

আমীনের প্রবন্ধগুলো' 'ফয়দ আল খাতিবের" নামে প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রবন্ধ সাহিত্য ও সমালোচনা তথা ইসলামী বিষয়ে ব্যাপকভাবে লিখিত। আধুনিক যুগের সকল প্রবন্ধকারের ওপর তাঁর প্রাধান্য রয়েছে। তাঁর প্রবন্ধগুলো সাদাসিধে ও চিত্তাকর্ষক ছিল। আহমদ আমীন শিল্প হিসেবে প্রবন্ধের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিতে পেরেছেন। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধলেখক হলেন মুস্তফা সাদিক আল-রাফি'য়ী। তিনি "ওয়াহই আল-কলমে" উৎকৃষ্ট "মাকামাতের" একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। রাফি'য়ীর প্রবন্ধ উচ্চ চিন্তা-ভাবনার অবতারণা করেছে। ফলে তাঁর রচনাশৈলী চিত্তাকর্ষণ ও মনমাতানোর দিক থেকে আহমদ আমীনকে ছেড়ে গিয়েছে। রাফি'য়ী তাঁর প্রবন্ধগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তবে প্রত্যেক প্রবন্ধে রচনাশৈলীর সৌন্দর্য পূর্ণচন্দ্রিমার ন্যায় উজ্জ্বলতা ও স্নিগ্ধতার এক উৎস হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। রচনাশৈলীর সৌন্দর্য তাঁর প্রবন্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে। অতঃপর এর সাথে উন্নতমানের চিন্তাধারা ও দার্শনিক তত্ত্ব সোনায় সোহাগা করে দিয়েছে।

এ-সকল প্রবন্ধকার ছাড়াও সকল উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক "রিসালা" লিখতেন। তাঁদের মধ্যে আক্কাদ, তাহা হুসাইন, মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল ও আব্দুল কাদির, আল-মাগিনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা প্রবন্ধের কলাশিল্পের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং নিজ নিজ প্রবন্ধগুলোকে সমালোচনামূলক ও সাহিত্যমূলক প্রবন্ধে পরিণত করতে সচেষ্ট ছিলেন।[২৩]

সমালোচনা লেখা

সাহিত্যসমালোচনা ক্লাসিকধর্মী আরবী সাহিত্যকে অনেক উন্নত করেছিল। আব্বাসীযুগে জাহিয, ইবন আল-মু'তাযয, কোদামা বিন জা'ফর, আব্দুল কাহির আল জুরজানী এবং ইবনে রাশিক-এর ন্যায় বিজ্ঞ ও প্রতিভাবান সমালোচক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আব্বাসী যুগের শেষ দিকে সাহিত্য সমালোচনার গতি থেমে গিয়েছিল। এই জড়তা কয়েক শতাব্দী ধরে বিরাজ করছিল। এখন নতুন সাহিত্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তা আরবী সমালোচনাকে নতুন জীবন দান করেছে এবং পাশ্চাত্য সমালোচনার ধারায় আরবী সমালোচনা, চিন্তা ও কলা নতুন

ঝলকে ঝলসিয়ে ওঠে। সমালোচনার মধ্যে গভীরতা আকড়িয়ে ধরতে সক্ষম হয়েছে এবং নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আরবগণ সাহিত্য সমালোচনার ব্যাপারে ফরাসী ও ইংরেজী—উভয় ভাষা হতে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে ও উপকৃত হয়েছে। এজন্যেই আধুনিক আরবী সমালোচকদের মধ্যে দুটি দল পরিলক্ষিত হচ্ছে। একদলের মানসিক সংস্কৃতির ঊর্ধ্বগতি ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে এবং অপরদল ইংরেজী সাহিত্য ও চিন্তাভাবনা দ্বারা নিজেদের মানসিকতাকে সেভাবে গড়ে তোলে। প্রথম দলের মধ্যে তাহা হুসাইন, মাযিনী ও অন্যান্য প্রখ্যাত সমালোচকগণ ছিলেন। দ্বিতীয় দলের মধ্যে আক্কাদ, আহমদ আমীন ও অন্যান্য সমালোচকগণ ছিলেন; তাঁরা ইংরেজী সাহিত্যের উৎসগুলো থেকে রসাস্বাদন লাভ করে নিজেদের মানসিকতাকে সিক্ত করেছেন।

আরব সমালোচকদের মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য দল দেখা যাচ্ছে। একদিকে ঐ সকল সমালোচক রয়েছেন যাঁরা ব্যবহারিক সমালোচনায় অংশ নিয়েছেন এবং অন্য সমালোচক দল তাত্ত্বিক সমালোচনার ওপর লিখেছেন। যদি আমরা এ-সকল সমালোচকের ব্যাখ্যা করি, তাহলে আমরা জানতে পারব যে, আরবী ভাষা ও সাহিত্য নিজের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাধারা ও উন্নতমানের কলা-কৌশলের নিদর্শন বহন করছে। এর মধ্যে ফরাসী ও ইংরেজী—উভয় ভাবধারার সুন্দর সংমিশ্রণ রয়েছে। যে-সকল সমালোচক ব্যবহারিক সমালোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে তাহা হুসাইন, আক্কাদ, শাওকী দায়েফ ও অন্যান্য সমালোচকগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ স্বরূপ, তাহা হুসাইন "সাআতুন মা'আল মুতানাব্বী" নামক গ্রন্থে কবি মুতানাব্বী সম্পর্কে উৎকৃষ্ট সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। এভাবে তিনি "হাদিসুল আরবিআ" গ্রন্থে আব্বাসী যুগের কবিদের সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করেছেন। "আদাবুল জাহিলী" ও "যিকর আবীল আলা আল-মা'আররী"—গ্রন্থদ্বয় তাঁর সমালোচনা সাহিত্যের দুর্লভ নিদর্শন। আক্কাদ ব্যবহারিক সমালোচনার ক্ষেত্রে "ইবন আল-রুমীর" ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। আক্কাদের পূর্বে আব্বাসী যুগের এই মহান কবির ওপরে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়নি। আক্কাদ কবির বিভিন্ন দিকের আলোচনা ও

পর্যালোচনা করেছেন এবং তাঁর চিন্তা ও কলার সুপ্ত দিকগুলোকে দীপ্তিমান করে তোলেন।

তাত্ত্বিক সমালোচনার ক্ষেত্রে আহমদ আমীন ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা হ'তে উপাদান সংগ্রহ করে "আল নকদ আল-আদাবী" নামে দুই খণ্ডে একটি বই লিখেছেন। তিনি এই পুস্তকে সমালোচনার নীতিগুলো আরবী সাহিত্যের উদাহরণ দ্বারা পেশ করেছেন। এটাই হলো সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম যাতে আরবী ভাষায় পুরাতন ও আধুনিক আরবী সমালোচনার নীতিমালা উপস্থাপন করা হয়েছে। সৈয়দ কুতুব "আল-নকদ-আদাবী" নামে সমালোচনার নতুন নীতি-মালার ওপর ভিত্তি করে অপর একটি বিখ্যাত বই লিখেছেন। বইটি সমালোচনার নীতির উজ্জ্বল নিদর্শনের দাবীদার। এভাবে আহমদ আল-শায়িব "উসুল আল-নকদ আল-আদাবী" নামে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। এই পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে আরবী সমালোচনার নীতিমালার সাথে পাশ্চাত্য তত্ত্বগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু হিলাল আল-গোনাইমী অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের ভাব-কল্পনা দ্বারা উভয় সমালোচনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ সমাধা করেছেন। সুহাইব আল-কলমাভীও আরবী সমালোচনার নীতিমালাগুলোর ওপর চমৎকার আলোচনা করেছেন।

আধুনিক যুগে অগণিত সমালোচক কবিতা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক লিখেছেন। তাঁরা আরব কবি ও সাহিত্যিকদের ওপর যথেষ্ট কাজ করেছেন। এদের মধ্যে শাওকী দায়েফ, মুহাম্মদ মানদূর, বদভী তাবানা, আহমদ বদভীর মত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বও রয়েছেন। তাঁরা নিজেদের সমালোচনার দ্বারা আরবী সাহিত্যে গভীরতা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গভীর চিন্তাধারাও প্রকাশ করেছেন।

ড. মুহাম্মদ মানদূর "আল নকদ আল-মানহাজী ইনদ আল-আরব" বইখানা লিখে সমালোচনার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি আরবী সমালোচনার প্রাচীন সম্পদগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আরব সমালোচকদের চিন্তার মৌলিক লাইনগুলোকে এবং মতবাদ ও তত্ত্বগুলোর মধ্যে একতা ও সমন্বয় সাধন করতে

চেষ্টা করেন। ড. মানদূরের বিশেষ মতবাদ হলো—কোন আরব সমালোচক গ্রীক চিন্তাধারা ও এ্যারিস্টটলের "কিতাব আল-শি'র" ও "কিতাব আল-খিতাবতের" দ্বারা আদৌ প্রভাবান্বিত হন নি; বরং আরব সমালোচকগণ প্রখ্যাত আরবী সমালোচক ইবন আল-মু'তাযয়, আল-আমিদী ও কাজী আল-জুরজানীর সমালোচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন এবং তাঁদের সমালোচনার নীতি ও ভাবধারা গ্রহণ করেছেন। আরব সমালোচকদের মতে আমিদী ও জুরজানী প্রকৃত-পক্ষে প্রখ্যাত আরব সমালোচক হিসেবে উপাধি পাবার অধিকারী। তিনি কোদামা বিন্ জা'ফরের সমালোচনার কর্মধারাকে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, তাঁর (কোদামার) সমালোচনামূলক প্রচেষ্টাগুলোর কোন ফলাফল বা নিদর্শন আরব সমালোচকগণ গ্রহণ করেন নি। আমার মতে ড. মানদূরের এই মতবাদ পক্ষপাতিত্বের ওপর ভিত্তি করে রচিত। কেননা, সমস্ত আরব সমালোচক কোদামার মতামত গ্রহণ করছেন এবং তাঁর মতামত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সুতরাং অন্য একজন নতুন আরব সমালোচক, ড. বদভী তাবানা নিজেই কোদামা বিন জাফরের সমালোচনার ওপর ভিত্তি করে "কোদামা বিন জাফর ওয়া আল-নকদ আল-আদাবী" নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং মুহাম্মদ মানদুরের মতবাদ প্রত্যাখান করেন। এই গ্রন্থে লেখক এ-কথাই প্রমাণ করেন যে, আরবী সমালোচকগণ কোদামা বিন-জাফরের মতবাদ থেকে উপকার লাভ করেছে। ড. মানদূর আধুনিক সাহিত্যের ওপর কয়েকটি বই লিখেছেন।

বদভী তাবানা তাঁর সমালোচনার মহত্ত্ব "আল-নকদ আল-আদাবী" ও "উমারাউল বায়ান" গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশ করেছেন। তিনি এই দুটি গ্রন্থে আরবদের সমালোচনার পুঁজিকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং গ্রন্থদ্বয়ের বিভিন্ন স্থানে তিনি নিজের মতামতকে গভীরভাবে প্রকাশ করেছেন।

শাওকী দায়েফ একজন ব্যবহারিক সমালোচক। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে আধুনিক যুগের সমালোচকদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছেন। শাওকী দয়েফ "আল কান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি আল-নছর" ও "আল ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফি আল শি'র" নামক গ্রন্থ-দ্বয়ে সমস্ত আরব সাহিত্যিক ও কবিদের অবস্থা ও তাঁদের রচনাশৈলীর

বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া আহমদ শাওকীর ওপর ভিত্তি করে "শাওকী শা'য়ির আল-আসর আল-হাদীস" নামক সমালোচনাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি আজ পর্যন্ত কবি সম্রাট শাওকীর ওপর রচিত একমাত্র উন্নতমানের সমালোচনা গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। শাওকী দয়েফ আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন এবং তিনি আধুনিক যুগের সাহিত্যিক ও কবিদের ওপর ভিত্তি করে কয়েকখানা বই রচনা করেছেন। "আল-আদাব আল-আরাবী আল-মু'আসির ফী মিশর" তার একখানা উৎকৃষ্ট রচনা। এভাবে "দিরাসাত ফি আল-শি'র আল-আরাবী আল-মু'আসির" নামক গ্রন্থখানা তাঁর সমালোচনার মহত্বকে উপস্থাপন করছে। এ-গ্রন্থে তিনি বারুদী হ'তে আবুরিশা পর্যন্ত সমস্ত আধুনিক কবিদের ওপর সমালোচনার দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন। ফলে শাওকী দয়েফ আধুনিক সমালোচকদের মাঝে আধুনিক সাহিত্যের ওপর সমালোচনামূলক প্রচেষ্টার ফলে একটি সম্মানজনক সঠিক স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। ব্যবহারিক সমালোচনার ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোন সমালোচক এত বেশী সমালোচনার কাজ সমাধা করতে পারেনি যতটা শাওকী দয়েফের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক গ্রন্থগুলোতে আমরা পেয়ে থাকি।

আহমদ বদভী ২০ থেকে ২৫ টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এদের অধিকাংশই ক্রুশযুগের সাহিত্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবুও সমালোচনার ওপর তাঁর রচিত "উসুস আল নক্‌দ আল-আদাবী ইন্‌দা আল-আরব" নামক গ্রন্থখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বইখানা অসাধারণ পরিশ্রম ও সাহিত্যিক উৎসগুলোর আলোচনা-পর্যালোচনার ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে। এর মধ্যে আরবী সমালোচনার ছোট-বড় বিষয়গুলো একত্রিত করে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। লেখক আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এতে ত্রুটি অনুভূত হয়। বিষয়বস্তু অগণিত; কিন্তু তার আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত। সমালোচক আরবী সমালোচনার তত্ত্বগুলোকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন মতামতকে উপস্থাপন করার জন্য এবং তার আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য কোন সঠিক পন্থা অবলম্বন করেননি। এতদসত্ত্বেও গ্রন্থখানা সম্মান পাবার উপযোগী এবং তা আরবী সমালোচনায় ব্যাপকতার সাক্ষ্য বহন করছে।[২৪]

আরবী গল্প, উপন্যাস ও ছোটগল্প লেখার ঊর্ধ্বগতি

রম্যরচনা বা লেখার নিদর্শন আমরা আরবদের পুরাতন উৎসগুলোতে দেখতে পাই। তারপর আব্বাসী যুগে এই সাহিত্য-শিল্প উন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে থাকে এবং চিন্তা ও কলার নতুন পথ অবলম্বন করতে থাকে। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের যুদ্ধের কাহিনী সাধারণ ও বিশিষ্ট লোকেদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তারপর ইসলাম পবিত্র কোর'আনের মাধ্যমে এই কলার সাহায্যে মানবতার সেতুবন্ধন রচনা করে এবং এর ফলে উপদেশ ও অভিজ্ঞতার নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। আব্বাসী যুগে তো গল্পলেখা পরিপূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে হয়েছিল। এই যুগে বিভিন্ন ভাষা হ'তে গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থ অনুবাদও করা হয়েছিল। এদের মধ্যে "এক হাজার এক রজনী" ও "কালীলা ও দিমনা" নামক বই দু'টি মৌলিক গুরুত্ব বহন করছে। এই যুগে ছোটগল্প লেখার ধারণা ও পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং "মাকামাত" এমন কতকগুলো কাল্পনিক গল্প যার মধ্যে হাসিখুশী এবং ভাষা ও বর্ণনার অদ্ভুত যাদুমন্ত্র দেখা যায়। এখানে এ-সত্যটি প্রণিধানযোগ্য যে, এ-সকল গল্পের মধ্যে পাশ্চাত্য কথাসাহিত্য চারুকলা, শিল্পকলা, সৌন্দর্যতত্ত্ব, কারুকার্যতা, সংলাপ, কাহিনী-কাঠামো ইত্যাদি বিবরণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া সংলাপ, শিল্পকলা, কাহিনী কাঠামো ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট ও বিশেষ নিয়ম ও পদ্ধতিতে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, ইউরোপীয় প্রভাব আরবদের মধ্যে কথাসাহিত্যের জন্ম দিয়েছে এবং আরবদের উন্নত স্বভাব এই শিল্প-কলাকে ঔজ্জ্বল্য ও সজীবতা দান করেছে। আরবগণ সর্বপ্রথম ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা হ'তে উপন্যাস ও আরবীয়দের চরিত্র ও পারিপার্শ্বিকতায় উপস্থাপন করতে আরম্ভ করে। রিফা'আ আল-তাহতাভী আরবীতে অনুবাদ করার আন্দোলন শুরু করলেন এবং তিনি "মাওয়াকি' আল-আফলাক ফি ওয়াকা'ই তিমাদ" নামে একটি বইয়ের অনুবাদ করেন; কিন্তু এই বইয়ের ভাষার মধ্যে ছন্দ ও মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে। সে যাই হোক, ধীরে ধীরে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লেখার প্রচলন গৃহীত হতে লাগল। পরবর্তী পর্যায়ে হাফিয ইব্রাহীম "আল-বু'সা" নামে ভিক্টোর হিউগোর একটি উপন্যাস আরবীতে অনুবাদ করেন। মুস্তফা লুৎফী আল-মানফালুতীও কিছু কিছু গল্প ও উপন্যাসের বই

আরবীতে অনুবাদ করেন। হাফিয ইব্রাহীম খুব সাধারণভাবে ফরাসী ভাষা জানতেন। তাই অতি কষ্টে তিনি "আল-বু'সা" উপন্যাসটি অনুবাদ করেন। মানফালুতী বন্ধুদের নিকট হতে ফরাসী গল্প ও উপন্যাসের বই পড়তে শুনতেন এবং সেগুলোকে তিনি আরবীতে অনুবাদ করতেন। তাঁর লিখিত "আল-কাদিলা"—এ ধরনের একটি উপন্যাস। অনুবাদের দ্বারা একটি উপকার হলো যে, পাশ্চাত্য কলা-শিল্প আরবীয় পরিবেশ ও কলাশিল্পের ক্ষেত্রে অতি সুন্দরভাবে সংমিশ্রণ করার একটা প্রচলিত নিয়ম সৃষ্টি হলো যা কথাসাহিত্যের অঞ্চলকে বাস্তব গৌরবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদকরা শিল্পনৈপুণ্যের রুচিবোধকেও হাতছাড়া করেননি।

কথাসাহিত্যে সর্বপ্রথম ছোট উপন্যাস অথবা দীর্ঘ গল্প আবিষ্কৃত হয়েছে এবং শিল্পকলার মানোন্নয়নের সাথে সাথে মিসরীয় সাধারণ জীবনের যে চিত্র অংকন করছে, তা হচ্ছে মুহাম্মদ হুসাইন হায়কালের প্রসিদ্ধ উপন্যাস "যয়নব"। কয়েক বছর পর মুহাম্মদ তৈমুরের গল্প সংগ্রহ "মা তারাহু আল-উয়ূন" প্রকাশিত হয়। মাহমুদ লাজীনও "ইয়াহকীরুন" ও "সুখরিয়্যাত আল নায়ী"-র মত কাহিনীসংগ্রহ প্রকাশ করে আরবী ভাষায় কথাসাহিত্যের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে আরও ব্যাপক করে তোলেন।

উপরোল্লিখিত কথাশিল্পীদের পর কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাস লেখক ও গল্প লেখকদের একটি বিরাট দল সাহিত্য জগতে আত্ম-প্রকাশ করে। তাঁদের মধ্যে তাহা হুসাইন, আক্কাদ ও আল-মাযিনী অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের গৌরব অর্জন করেন। মিশরীয় জীবনের বাস্তব চিত্র অংকনের ক্ষেত্রে তাহা হুসাইন বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর লিখিত "আল-আইয়্যাম", "দোয়া আল-কারাওয়ান" এবং "শাজারাত আল বুস" গল্প ও উপন্যাসগুলোতে মিশরের সাধারণ লোকের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি "এক হাজার এক রজনীর" প্রসিদ্ধ উপন্যাস "শহরযাদ" কে কাহিনী ধরে নিজের বিশেষ রচনাশৈলীর দ্বারা উপস্থাপন করে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

মাযিনী তাঁর গল্পসাহিত্যে বিশেষভাবে মানবীয় সত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তিনি নারীসত্তারও পুরোপুরি খবর রাখতেন। তিনি মিশরের

সামাজিক জীবনের চিত্র অংকনে সম্পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। যেহেতু, মাযিনী মিশরবাসীদের রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা ও প্রচলিত ভাবধারার সাথে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন, তাই তিনি নিজ শিল্পকলাকে সমাজের জীবন্ত সত্যরূপে উপস্থাপন করেন। অনুভূতি ও মনোবিজ্ঞানীর এই ভাবধারা তিনি প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য দেশ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। তার এ-ধরনের উপন্যাসের মধ্যে "ইব্রাহীম আল কাতিব" ও "আওদ আলা বদর" নামক বই দু'খানা সার্থকভাবে রচিত, যা তাঁর শিল্পকলার কষাঘাতের ব্যাখ্যা দিচ্ছে।

কথাসাহিত্যে আক্কাদের স্থানও অনেক উর্ধ্বে। তার গল্প প্রকৃতপক্ষে কাহিনী কাঠামোর বর্ণনা রচনার উপাদান ও উপকরণের দ্বারা ফলাফল নিরূপণ এবং এর সঙ্গে আত্মমনোবিজ্ঞানীর যৌন বিশ্লেষণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "সারা" উল্লেখ্য। এই উপন্যাস রচয়িতা আত্মিক ও তাত্ত্বিক—উভয় প্রকারের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ সৃষ্টিকারীকে সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করছে।

তাওফীক আল-হাকীম তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলোতে জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর আলোচনায় স্বদেশী ও জাতীয় সমস্যাগুলো স্থান পেয়েছে। তাঁর লেখায় প্রাচ্যের জীবন ধারার ব্যাখ্যা অত্যন্ত শিল্পনিপুণ পদ্ধতিতে পাওয়া যায়। তাঁর লিখিত এ-ধরনের উপন্যাসের মধ্যে "আওদাত আল রুহ" বা আত্মার প্রত্যাবর্তন এবং 'ইয়াও-মিয়্যাত নায়িব ফি আল-আবয়াফ" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ গল্প ও উপন্যাস ব্যতীত ঐতিহাসিক গল্প বা উপন্যাসও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সর্বপ্রথম জুরজী যায়দান ২০টিরও অধিক ঐতিহাসিক গল্প কিছুটা গ্রীক অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপন করেন। এসব রচনায় শিল্পকলার যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে এবং উপন্যাসের জন্য যে পদ্ধতি ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রয়োজন তা থেকে এসব গল্প সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর পুনরায় ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার প্রকৃত যুগ শুরু হয়। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম সফল উপন্যাসিক হলেন মোহাম্মদ ফরীদ আবু হাদীদ। তিনি "যিনূবীয়্যা" উপন্যাসে ইতিহাসকে নিপুণ রচনাশৈলীর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। এরপর তিনি অন্যান্য উপন্যাসও রচনা করেছেন। মোহাম্মদ ফরীদের পর

আলী আল-জারিম, মোহাম্মদ সাঈদ আল উরয়ান, মোহাম্মদ এ'উদ মুহাম্মদ প্রমুখ লেখকগণ উন্নতমানের ঔপন্যাসিক হিসেবে বিবেচিত।

মাহমুদ তৈমূর তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোতে সামাজিক জীবনকে চিত্রিত করার প্রচেষ্টা চালান। তাহা হুসাইন সহ তাওফীক আল-হাকীমও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তবে সত্য কথা হলো যে, এদের মধ্যে প্রত্যেক উপন্যাসিকের নিজস্ব বিশেষ রচনাশৈলী ও পদ্ধতি রয়েছে। তাওফীক আল-হাকীমও নিজ পদ্ধতিতে সফল উপন্যাস, গল্প ও রচনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জন করেছেন। নাজীব মাহফুয সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতি তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত রেখেছেন। আবার কখনো কখনো তিনি এক্ষেত্রে অকৃতকার্য হয়েছেন বলে দেখা যায়। এতদসত্ত্বেও তাঁর রচনায় শিল্পকলার রীতিনীতি পাওয়া যায়।

আধুনিক আরবী সাহিত্যের বর্তমান যুগে অগণিত গল্প লেখক ও ঔপন্যাসিক আত্মপ্রকাশ করেছেন। যুগই সিদ্ধান্ত নিবে যে, কে দীর্ঘ-জীবী হবার সৌভাগ্য অর্জন করবেন।[২৫]

আধুনিক আরবী সাহিত্যে নাটক

আরবদের প্রাচীন সাহিত্যে নাটক রচনার প্রচলন ছিল না। তাঁরা গ্রীকদের নাটক অনুবাদ করা সত্ত্বেও আরবী ভাষায় নাট্যশিল্পের প্রবর্তন করেননি। মূল কারণ হিসেবে প্রথমত, বলা যেতে পারে যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নাটক কিছুটা অপছন্দনীয় ছিল। দ্বিতীয়ত, আরবগণ সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেদেরকে অন্যান্য জাতির তুলনায় উৎকৃষ্ট মনে করতো। "কিতাব আল-শি'র" ও "কিতাব আল-খিতাবাত" অনুবাদের পরও আরবগণ নাটক লেখার দিকে নজর দেয়নি; অথচ "কিতাব আল-শি'র" এর মধ্যে ট্রাজেডী ও কমেডীর বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। সে যাই হোক, আধুনিক যুগে ফরাসীগণ কার্যকরভাবে মিশরে নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করল এবং নাটক দেখালো। কিন্তু মূলত এই নাটক ফরাসী ভাষায় ছিল বিধায় আরবদের মধ্যে এতে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। যখন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মিশরের সাথে পাশ্চাত্য দেশগুলোর সরাসরি সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখন নাটক রচনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলো। ইয়াকুব সানু মিশরে অনেকগুলো অনুবাদকৃত নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। তাঁকে মিশরবাসীরা "মিশরের মুলীয়র" উপাধি দেন।

অতঃপর সিরীয় ও লেবাননী কোম্পানী মিশরে আগমন করে। তারা প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া ও পরে কায়রোতে অনেকগুলো নাটক মঞ্চস্থ করে। এসব নাট্যশিল্পী ফরাসী ভাষা হতে আরবীতে অনুবাদ করে নাটক মঞ্চস্থ করতেন। কিন্তু তাঁদের ভাষা ছন্দ ও মাত্রাযুক্ত হতো। সাথে সাথে কবিতাও বহুলাংশে স্থান পেত। সালীম আল-নাক্কাশ, আবু খলীল কাব্বানী, সিকান্দর কারাহ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এ যুগের উল্লেখযোগ্য নাটক রচয়িতা ছিলেন। তাঁদের মানসিক ক্ষেত্র ছিল ফরাসীয়। আবার মিশর-বাসী নিজেরাই এই কলাশিল্পে যোগ দেন। আক্কাশা, শেখ সাল্লাম হিজাযী ও আজীজ প্রমুখ নাট্যশিল্পী নিজস্ব কোম্পানী গঠন করেন। জর্জ আবয়াদ প্যারিস থেকে নাট্যশিল্প সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে ১৯১০ সালে মিশর প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিনি নিজ উদ্যোগে ১৯১২ সালে মিশরে "জমিয়তে আনসার আল-তামছীল" নামে একটি নাট্যশিল্প প্রতিষ্ঠা করেন।

নাট্য-সাহিত্যের এ-সকল প্রাথমিক প্রচেষ্টার মধ্যে শিল্পত্রুটি ও অদক্ষতার কারণে এ-যুগের সব নাটক সাহিত্য-মর্যাদা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। নাটক রচনার প্রধান যুগে তিনজন নাট্যকার কলানৈপুণ্যের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছেন। তারা হলেন—ফারাহ আনতুন, ইব্রাহীম রমযী ও মাহমুদ তাইমুর। ফারাহ আনতুন "মিশর আল জাদীদা ওয়া মিসর আল কাদীমা" ও "আল-সুলতান সালাহউদ্দীন ওয়া মুমলিকাতুহ য়ারুশলাম" নামক দুটি নাটক লিখেন। ইব্রাহীম রমযী ১৯১৫ সালে "আবতাল আল-মানসূরা" নামক নাট্যশিল্পের এই সুন্দর নাটকটি লিখেন। ১৯২১ সালে মাহমুদ তৈমুর ফ্রান্সে গমন করেন। সেখানে তিনি আধুনিক নাটক লেখার কলাকৌশল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। ফলশ্রুতি হিসেবে তিনি চারটি নাটক লিখেন। নাটকগুলো হলো—"আল-উসফূর ফি কাফাস," "আব্দ আল-সাত্তার আল-আফিন্দী" "আল-আদীয়্যা", "আল-আশারা আলতায়্যিবা'। এ-নাটকগুলো লেখার সময় নাট্যশিল্পের নিয়ম-কানুন সতর্কতার সাথে পালন করা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউসুফ ওয়াহাবী, 'আযীয 'ঈদ ও আনতুন ইয়াযিক প্রমুখ ব্যক্তিগণ নাটক লেখায় খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু চলচিত্রের প্রচলন নাটকের আনন্দঘন মুহূর্তগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে।

সে যাই হোক, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নাটক রচনাকারীদের দল পুনরায় দৃষ্টিগোচর হ'তে থাকে। এই দলের নিকট আরবী নাটক সম্পূর্ণ কলাকৌশলের সাথে সার্থকভাবে আরবী সাহিত্যের একটি উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। এই আধুনিক নাটক লেখকদের মধ্যে তাওফীক আল হাকীম ও মাহমুদ তৈমুরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নাট্যশিল্পকে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত করেছেন।[২৬]

প্রাচীন ও আধুনিক মতাবলম্বী শিল্পীগোষ্ঠী

আধুনিক গদ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে মুস্তফা সাদিক আল-রাফিয়ী ও তাহা হুসাইনের মধ্যে সৃষ্ট সাহিত্যিক মতবিরোধ বর্ণনা করা অপরিহার্য। সালামা মূসা "আল-হিলাল" নামক সাময়িকীতে রাফি'য়ীর রচনার কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং তাঁকে তিনি পুরাতন পন্থী শিল্পীগোষ্ঠীর মুখপাত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই আলোচনার বিপক্ষে তাহা হুসাইন বিতর্কের অবতারণা করেন এবং তিনি রাফি য়ীর ধ্যানধারণার বিরোধিতা করে বলেন যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত সাহিত্যিকগণও বিশুদ্ধ আরবী লিখছেন। রাফি'য়ীর মূল প্রশ্ন ছিল যে, এ-সকল পাশ্চাত্য সভ্যতা অনুসারী লেখকগোষ্ঠী আরবী ভাষাকে ধ্বংস বা বিলীন করে দিতে চায় এবং তাতে আরবী সভ্যতা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

তাহা হুসাইন ডেকার্টের ন্যায় দার্শনিক সন্দেহবাদের মোহে পড়ে জাহিলী যুগের অধিকাংশ কবিদের ব্যাপারে তাঁর "ফী আল-আদব আল-জাহিলী" গ্রন্থে মন্তব্য করে বলেন যে, এ-সকল কবি ও কবিতা নিছক বানানো। রাফি'য়ী ও অন্যান্য প্রতিভাবান সাহিত্যিকগণ এই মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন। সে যাই হোক, তাহা হুসাইন তাঁর মতামতের ওপর অবিচল থাকলেন।

উল্লেখ্য যে, যে-সকল সাহিত্যিককে আমরা রক্ষণশীল অথবা প্রাচীন মতবাদের গোষ্ঠী বলে মনে করি, তাঁদের ব্যাপারে এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, তাঁদের রচনাশৈলী এবং ধ্যানধারণা কখনো আব্বাসী অথবা প্রাচীন যুগের সাহিত্যিকদের মত নয়; বরং তাঁদের ভাষায় ও লিখনীতে শুধু প্রাচীন প্রভাব সমূহের ঝলক পাওয়া যায় অথবা তাঁদের সাহিত্য-অভিরুচিগত প্রাচীনতার প্রভাব বিরাজ করছে। তা না হলে

রাফি'য়ী, মানফালুতী, মুওয়াইলীহী ও আহমদ হাসান যায়্যাতের ন্যায় প্রখ্যাত লেখকদের লেখায় ছন্দ ও মাত্রা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়নি এবং চিন্তা ও ধারণার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যদের উৎসগুলো হতে চয়ন করাকেও তাঁরা লজ্জাস্কর ব্যাপার মনে করতেন না। এভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কল্পনাসমূহের সুন্দর মিশ্রণ তাঁদের লেখায় পাওয়া যায়। তবে পার্থক্য হলো যে, তাঁদের লেখায় ও বর্ণনায় প্রাচ্যের সভ্যতার ব্যাপকতা বিরাজ করছে। এই গোষ্ঠীর বিপরীত দিকে রয়েছে তাহা হুসাইন, আক্কাদ ও মাযিনীর মত প্রখ্যাত শিল্পীবৃন্দ। তাঁদের লেখায় ও রচনায় আধুনিকতার প্রাধান্য বেশী। উভয় গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের রচনা-শৈলীর মধ্যে আপাত পার্থক্য হলো এই যে, প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকদের রচনাশৈলী কিছুটা কঠিন ও মনোরম শব্দ দ্বারা মার্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। কখনো কখনো ছন্দ বা মাত্রা স্বাভাবিক ভাবে এসে যায়। এই অবস্থা প্রাচীনপন্থীদের মাঝে তখনও কপটতার সাথে বিরাজ করছিল। একইভাবে নতুনপন্থী তথা তাহা হুসাইনের রচনায় পর্যাপ্ত দীর্ঘকরণ ও সমার্থকতা দেখা যায়। কিন্তু তাঁরা ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নতুনত্বপ্রিয় বলে প্রমাণিত হয়েছেন। সে যাই হোক, আধুনিকতার সাথে প্রাচীনতার উপাদান দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রত্যক্ষ ভাবে পাওয়া যায়। শুধু পার্থক্য হলো যে, এক গোষ্ঠীর প্রবণতা প্রাচীনতার দিকে এবং অন্য গোষ্ঠীর মানসিকতা আধুনিকতার দিকে।

মুহাম্মদ হুসাইন "সাওরাত আল-আদব" উপন্যাসে মিসরবাদীদিগকে ফেরাউনের যুগ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সাহিত্যকে আধুনিকীকরণের উপদেশ দেন; কিন্তু এই মাতৃভূমি পূজার ভ্রান্ত আন্দোলন সফল হয়নি। এমনকি তাঁরাও ইসলামের উৎসগুলো হ'তে সাহিত্যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ), হযরত আবুবকর ও হযরত উমরের সম্মানজনক আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

বর্তমানেও আধুনিক আরবী সাহিত্যে এ দু'প্রকার ভাবাদর্শের গোষ্ঠী বিরাজ করছে। প্রাচীন কল্পনার মুখপাত্র হলেন মুস্তফা সাদিক আল-রাফিয়ী, মুস্তফা লুৎফী আল মানফালুতী, মুহাম্মদ আল-মুওয়াইলীহী এবং আহমদ হাসান আল-যায়্যাত। অপর দিকে আধুনিক রচনাশৈলীর মুখপাত্র হলেন তাহা হুসাইন, আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, মাযিনী, আহমদ আমীন ও অন্যান্য লেখকগোষ্ঠী।[২৭]

জনপ্রিয় ও বিশুদ্ধ আরবী

ইংরেজগণ প্রচলিত আরবী ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা বানানোর জন্যে পূর্ণপ্রচেষ্টা চালিয়েছিল। অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে ইংরেজদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ; যেহেতু আরবী ভাষায় পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই কোরআনই আল্লাহর পথ-নির্দেশনার একমাত্র উৎস। এই ভাষার ওপর সমগ্র আরববাসীর একতা নির্ভরশীল ছিল। যদি প্রত্যেকটি আরবদেশের প্রচলিত ভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসেবে স্থান পায়, তা হলে সব উপভাষা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই উইলিয়াম ওয়াল কাকস এই আন্দোলনকে অনেক জোরালো করলেন। ফলে তিনি শেক্স-পিয়ারের কয়েকটি নাটক প্রচলিত ও জনপ্রিয় ভাষায় অনুবাদ করালেন। বাইবেলের কিছু অংশ প্রচলিত আরবীতে অনুবাদ করা হয়। এ-সমস্ত অনুবাদের ভাষা ত্রুটিপূর্ণ বলে ধারণা করা হয় এবং সাধারণভাবে এগুলো গ্রহণযোগ্য হয়নি। বেশ কিছু ইংরেজ ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের পণ্ডিতবর্গ এ-আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। সৌভাগ্যক্রমে মুসলমানগণ এই চক্রান্ত সহজেই বুঝে ফেলে। তারা এই আন্দোলনের তুমুল বিরোধিতা করে। মুসলমানগণ আন্দোলনের কর্মসূচী হিসেবে কতকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করলেন। এই প্রতিষ্ঠান-গুলোতে শুধু বিশুদ্ধ আরবী পড়ানো হতো এবং প্রচলিত ভাষার বিরোধিতা করা হতো। সুতরাং মুহাম্মদ মুওয়াইলীহী বিশুদ্ধ আরবী প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি দল নিয়োগ করেন।

নীল নদের কবি হাফিজ ইব্রাহীম বিশুদ্ধ আরবী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা রচনা করেন। এই কবিতায় তিনি বিশুদ্ধ আরবী ভাষার মুখপাত্র হিসেবে বলেন :

> আমি (আরবী ভাষা) আল্লাহর গ্রন্থ (পবিত্র কোরআন)-কে শব্দ ও অর্থ উভয় প্রকারে নিজের বক্ষে গুপ্ত (সম্পদ হিসেবে) রেখেছি। আমি নিদর্শনাবলী ও উপদেশসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে সংকীর্ণ ছিলাম না; সুতরাং বর্তমান যুগে আমি যন্ত্রপাতি বর্ণনা করতে কেন সংকীর্ণতা অনুভব করতে পারি? এবং আবিষ্কারের নাম তৈরীর ক্ষেত্রে আমার কেন কষ্ট হবে? আমিতো এমন একটি সমুদ্র যার বক্ষে মণিমুক্তা লুকায়িত আছে। তবে কি তারা আমার ঝিনুক সম্পর্কে ডুবুরীদেরকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছে? তোমাদের

কি এটা ভাল লাগবে যখন একজন পাশ্চাত্যবাসী চিৎকার দিয়ে আমার পরিপূর্ণ যৌবনের শুরুতেই এবং জীবনের আনন্দঘন মুহূর্তেই আমাকে সমাধিস্থ করার আমন্ত্রণ জানাবে ?

আমার জাতি (আরবী ভাষাভাষীগণ) কি আমাকে এমন একটি (প্রচলিত) ভাষার প্রতি ন্যাস্ত করবে যা বর্ণনা করার অপেক্ষা রাখেনা ?

এই (প্রচলিত আরবী) ভাষায় ইংরেজদের মাতলামী এমনভাবে ছড়িয়ে গেছে যেমনিভাবে সাপের বিষ ফোরাত নদীর স্রোতে বয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং এই ভাষা ছলনাপূর্ণ ও নানা রঙের সত্তরতালি যুক্ত কাপড়ের ন্যায় হয়ে গেছে।

ইংরেজগণ আরবদের ওপর এই প্রভাবও বিস্তার করতে চেয়েছিল যে, আরবদের অবনতির মূল রহস্য হলো, তারা এখনো পবিত্র কোরআনের ভাষাকে বক্ষে জড়িয়ে রেখে আছে। এ-কারণে তাদের ভাষা জীবনের সাথী হবার যোগ্যতা হারিয়েছে। যদি তারা প্রচলিত ভাষাকে আপন করে নেয়, তা হলে আগে অগ্রসর হবার জন্য তারা সাহায্য পাবে। যতক্ষণ সাধারণ লোক নিজের ভাষায় কথা বলতে পারবে না, ততক্ষণ তারা কিভাবে আগে পা বাড়াতে পারে ? এবং কিভাবে তারা ভাষা বুঝতে পারবে ? তবে সৌভাগ্যক্রমে আরবগণ ইংরেজদের ধৃষ্টতা বুঝতে পেরেছিল। যদি তা না হতো তা হলে ইংরেজগণ তাদের ভাষার মূল কেটে দিতো।[২৮]

আধুনিক গদ্য ও তার শিল্পরীতির ক্রমবিকাশ

ফরাসীগণ মিশর থেকে বিদায় নেয়ার পর আধুনিক মিশরে সামাজিক, রাজনৈতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন জীবনের সূচনা হয়। মিশরীয়গণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, মুহাম্মদ আলী তাদেরকে এসব অধিকার ভোগ করার সুযোগ দিতে পারেননি। ফলে অধিকারগুলো মিশরীয়দের অন্তরে গোপনে দানা বেঁধে উঠছিল। খেদীভ ইসমাইলসহ মিশরের পরবর্তী শাসকগণের যুগে এসব অধিকার আদায়ের ক্ষেত্র তৈরী হলো। তবে

মুহাম্মদ আলীর যুগ থেকে মিশরীয়গণ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সংযুক্ত হবার চেষ্টা করে। শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানই নয়, বিভিন্ন বিষয় ও সামাজিক দিকগুলোতেও এদের নিরলস প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ফরাসীগণ তাদের মাঝে এমনভাবে জীবন-যাপন করত, যে-সম্পর্কে মিশরীয়গণ ইতিপূর্বে পরিচিত হয়নি। মিশরবাসীরা ফরাসীদিগকে বেশ কিছু কলা ও শিল্প নিয়ে খেলা করতে দেখেছেন। যেমন নাটক, থিয়েটার, নাচ ও গান। যদিও মিশরবাসীরা কিছু কিছু শিল্পকলাকে মানতে চায়নি; কিন্তু এসব শিল্পকলা তাদেরকে এই চিন্তাভাবনার দিকে ঠেলে দিয়েছে যে সমুদ্রের ওপারে একটি নতুন পৃথিবী রয়েছে যার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত—শুধু তাদের পার্থিব বিষয়ে নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক বিষয়েও।[২৯]

মিশরবাসীগণ মুহাম্মদ আলীকে তাঁদের যাবতীয় ক্ষমতা অর্পণ করে। সুতরাং মুহাম্মদ আলী ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সেনাবাহিনী সজ্জিত করতে লাগলেন। এই উপলক্ষে তিনি সামরিক স্কুল ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তারপর তিনি মেডিকেল কলেজ ও কৃষি কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। এ-সব কলেজ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীকে শৃঙ্খলা, চিকিৎসা, কারিগরী ও প্রকৌশল জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা সুসজ্জিত করা। এসব প্রতিষ্ঠান তিনি ইউরোপীয় ভঙ্গীতে তৈরী করলেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ করেন। তিনি ইউরোপীয়ান ও মিশরীয়দের ভাষা পরস্পর বুঝার জন্য আরমেনীয়া ও অন্যান্য দেশ হ'তে দোভাষী নিয়োগ করেন। এর কিছু কাল পর তিনি ভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। তিনি পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বিদেশী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য মিশরীয় প্রতিনিধি পর্যায়ক্রমে পাঠান। তখন হতেই খাঁটি মিশরীয় চিন্তাধারা ও আধুনিক পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার মধ্যে সুশৃঙ্খল বন্ধন গড়ে ওঠে। তবে প্রথম দিকে এই সম্পর্ক শুধু ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে সম্পর্কের এই বন্ধন ছিল না বললেই চলে। কেননা তখন পর্যন্ত সত্যিকারভাবে আরবী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যগুলোর মধ্যে কোন নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এটা সত্য কথা যে, শুধু দুই জাতির মিলনের মাধ্যমে একটি জাতির সাহিত্য

অন্য একটি জাতির সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে পারে না। বরং এর জন্য কিছু সময় দরকার হয় যাতে একটি জাতি অন্য জাতি থেকে কিছু উপাদান গ্রহণ করবে, তাকে নিজস্ব অভিরুচি মোতাবেক হজম করবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এমন একটি নতুন সাহিত্যে রূপদান করবে যার নিজস্ব একটি প্রভাব, গুরুত্ব ও স্বকীয়তা থাকবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরবী গদ্য-সাহিত্যের রূপ পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় অবিচল ছিল। ফলে, পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও রুচি অনুসারে ছন্দোবদ্ধ ও স্টাইলযুক্ত শব্দের সংযোগে গদ্যসাহিত্য লেখা হতো। এ-সময়ে মিশরে আবদুল্লাহ ফিকরীর ন্যায় একদল দাওয়াভীন লেখকের আবির্ভাব হয়। এদের মনোভঙ্গি দাওয়াভীন ওয়াযীর সালাহউদ্দীন ও তাঁর দলের পরবর্তী লেখকদের মানসিকতা হতে বেশী দূরে ছিলনা। এসব দাওয়াভীন লেখক ছন্দোবদ্ধ গদ্যের ভঙ্গীতে রাষ্ট্রীয় ফরমান ও বক্তৃতাগুলো লিখতেন। তাঁরা শুধু ছন্দের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না; বরং বদী এর অন্তর্ভুক্ত শব্দ ও সাদৃশ্যমূলক শব্দ ব্যবহার করতেন। মিশরবাসীগণ এর ফলে প্রকৃত সাহিত্যের অনুভূতি থেকে দূরে থাকলো। মুহাম্মদ আলী মিশরবাসীদের এই অনুভূতিকে দমন করার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। সুতরাং তিনি কখনো কখনো মিশরের বড় বড় পদে মিশরীয়দের পরিবর্তে তুর্কীদিগকে নিয়োগ করতেন। সুতরাং মিশরবাসী ও তাদের আরবী ভাষা ক্রমোন্নতির ধাপ থেকে অনেক পেছনে রয়ে গেল। এর মূল কারণ শাসকগণ মিশরবাসীদের ওপর সরকারী কার্যালয়ে ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে তুর্কী ভাষা চাপিয়ে দিয়েছিল। বোলাক ছাপাখানাতেও তুর্কী ভাষায় বই ছাপা হতো।

তবে এ-সময় আরবী ভাষা নতুন যৌবন প্রাপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আরবী ভাষা বিদেশী ভাষাগুলোকে দক্ষতার সাথে আয়ত্ত করেছে। ফলে, মিশরবাসীগণ আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ভাষাকে পড়তে ও বুঝতে লাগলো; যা পড়তো তা উপভোগ করতো ও মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতো। রিফা'আ আল-তাহতাভী এই নবযৌবনের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি আল-আযহারে পড়াশুনা শেষ করেন এবং মুহাম্মদ আলী কর্তৃক বিদেশ-পাঠানো বৃহৎ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। তিনি দক্ষতার সাথে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। প্যারিসে অবস্থান কালে তিনি "তাখলীস আল-ইবরীয ফী তালখীস বারিয"

নামক গ্রন্থে ফরাসীদের পার্থিব, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। মিশর প্রত্যাবর্তনের পর তিনি অনুবাদের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং তাঁকে ভাষা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রচিত বই ফরাসী ভাষা হতে আরবীতে অনুবাদ করেন।[৩০]

রিফা'আর অনুবাদ সংক্রান্ত কার্যাবলী মিশরীয় সাহিত্যের নব-জাগরণের সূচনা হিসেবে কাজ করেছিল। তবে রিফা'আ ও তার ছাত্রগণ ছন্দ ও অলংকারজনিত ভাষা হ'তে মুক্ত ছিলেন না; বরং তারা ইউরোপীয় সাহিত্যের বিষয়বস্তুসমূহ ছন্দোবদ্ধ ও অলংকারজনিত ভাষায় লিখতে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, তাঁরা ইউরোপীয় সাহিত্যের বিষয়বস্তু সহজ ও সরল ভাষায় অধ্যয়ন করতেন; কিন্তু অধীত বিষয়কে তারা কঠিন আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করতেন, যা নানা প্রকার কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ ছিল। ফলে, অনেক কষ্টে সে-সব লেখা বুঝা যেতো। এরূপ জটিল লেখার দ্বারা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ শেষ হয় এবং দ্বিতীয়ার্ধও অনুরূপ ছন্দ ও বদী'এর লেখা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং পাশ্চাত্য সাহিত্যের গতি আরবী সাহিত্যকে স্বাধীন করতে পারেনি এবং শৃঙ্খল হ'তে তাকে মুক্তও করতে পারেনি। এই অবস্থায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর গদ্য-সাহিত্যকে মুক্ত করার জন্য এবং কঠিন বন্ধন হ'তে তাকে পরিত্রাণ দেয়ার জন্য বেশ কতকগুলো মূল উৎসাহদানকারী বস্তু ও উপাদান সংঘবদ্ধ হয়। কারণ, অনেকগুলো বিভ্রান্তিকর বস্তু অন্য কতকগুলো দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তুর সাথে মিলিত হয়ে একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। এ-সকল বিষয় মিশরীয়দের জীবনের সর্বদিকের উপাদানগুলোকে শামিল করে এবং তার মধ্যে একটি পরিপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করে। এর শুভ ফল হিসেবে সর্বপ্রথম জনমত সৃষ্টি হয়, জাতীয় চেতনা ও ভাবনার উন্মেষ ঘটে এবং ছিনিয়ে নেয়া রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে মিশরীয়দের অনুভূতি জাগে। মুহাম্মদ আলী এই অধিকারগুলোকে মিশরীয়দের অন্তর থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তা সংগোপনে তাঁরা লালন-পালন করে এবং তাঁরা মুহাম্মদ আলীর সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে লাগলেন। এ-সময় সেনাবাহিনী মিশরীদেরকে তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপারে

সাহায্য করছিল। শুধু তাই নয়, সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণ লাভ করতে থাকে এবং এ-উদ্দেশ্যে দলে দলে ইউরোপে গমন করে। তাঁরা ইউরোপীয়ানদের রাজনৈতিক জীবনকে তাঁদের নিজস্ব জীবনের পরিপন্থী দেখতে পেলেন। ফ্রান্সের জনগণ একনায়কতন্ত্রের অধীনে শাসিত নয়। তারা প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে শাসকের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। রিফা'আ তাঁর 'তাখলীস' গ্রন্থে ফ্রান্সের রাজনৈতিক জীবন ও মিশরের রাজনৈতিক জীবনের মধ্যকার পার্থক্য তুলে ধরেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ফ্রান্স জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায় প্রতিষ্ঠিত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রাচীন মিশরের চিত্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালার পুনঃপ্রচলন এবং মিশরীদের প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা মিশরীয় জনগণের অনুভূতিকে আরো বর্ধিত করে। এ-সবের মাধ্যমে তারা সম্মানজনক স্বাধীন জীবন অন্বেষণ করতে লাগল। ফলে, খেদীভ ইসমাইলের শাসনামলে মিশরীয়গণ প্রশাসন ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করলো। কারণ, ইসমাইল এমন পথ অবলম্বন করলেন যার চারদিক বিপদ দ্বারা বেষ্টিত। আর যদি তাঁকে অপসারণ করা হয় এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্জন করা হয়; অথচ তার রাজনৈতিক প্রশাসন খুবই দুর্বল ছিল, তা হলে দেশ অচিরেই পাশ্চাত্য শক্তির শিকারে পরিণত হবে। কার্যতঃ পাশ্চাত্যবাসীরা আরবদেশসমূহের জন্য ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ের রক্ষক ও উপদেষ্টা নিয়োগের বাহানা দিয়ে কিছু সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রস্তুত রাখে যারা ভয়াবহ খারাপ পরিণতির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী দিবে। ইসমাইল তাঁর অজ্ঞতার কারণে এবং তাঁর চারদিকে তুর্কীদের অবস্থানের কারণে তিনি তা ত্যাগ করতে পারেননি এবং সঠিক পথেও পরিচালিত হতে পারেননি।

মিশরবাসী এ-সব ভয়াবহ বিপদকে উপলব্ধি করলেন। তাঁরা নিজদেশে থেকেও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারছেন না। সুতরাং তাঁরা তাঁদের যাবতীয় বিষয় ঠিক করতে চাইলেন এবং আকাশের নীচে স্বাধীন জীবন যাপন করতে সংকল্পবদ্ধ হলেন। অতএব তাঁরা প্রথমেই বিশৃঙ্খল ও স্বৈরাচারী শাসক থেকে দেশকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর হলেন। দ্বিতীয়তঃ তুর্কীদের নাগপাশ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে চাইলেন।

কারণ স্বৈরশাসনের সাথে তারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল এবং সেনাবাহিনী তার ও বাইরে বড় বড় পদে তুর্কীদিগকে অধিষ্ঠিত করে।

মিশরবাসীদের চিন্তা শুধু তাঁদের মাতৃভূমিকে নিয়েই ছিল না; বরং তাঁরা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে ও বিশ্ব-মুসলিমদের ওপর আপতিত দুর্বলতা ও অনৈক্যের ব্যাপারেও চিন্তিত ও শংকিত ছিলেন। এ-সময় পশ্চিমাগণ তাদের দেশের কোন কোন অংশের শাসক ছিল এবং তুরস্কের ইসলামী খিলাফত পাশ্চাত্য শক্তির ব্যাপক পরিচালনার কারণে টুকরো টুকরো হবার মত হয়ে গেল। মিশরীয়গণ দূরদর্শিতার সাথে বুঝতে পারল যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগের উৎসসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করা প্রয়োজন। ধর্মকে কল্পনা ও কুসংস্কার থেকে পবিত্র করা উচিত। অতএব তাঁরা প্রাচীন গ্রন্থ ও আব্বাসীযুগের মুসলমানদের লিখিত বই পাঠ করতে লাগলো। পরিবর্তনের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকা। কারণ, এ-সময় আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু শেষ যুগের লিখিত বই পড়ানো হতো। এই বইগুলো জটিল বাক্য ও রচনা-শৈলীতে পূর্ণ ছিল।

ধর্মীয় ব্যাপারে প্রাথমিক উৎসগুলো সম্পর্কে সন্ধান পাওয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে ঐ একই উৎসগুলো সম্পর্কে অন্যভাবে সন্ধান পাবার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কেননা, ইবন আল-মুকাফ্ফার "কালীলা ওয়া দিমনার" মত পুরাতন সাহিত্যের বইগুলো ছাপাখানায় প্রকাশিত হতে লাগল। সুতরাং সংস্কৃতিমনা লেখকগোষ্ঠী বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন নতুন নমুনা-সমূহ দেখতে পেলেন যা তাঁদের পরিচিত বস্তু হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল। এর মধ্যে কৃত্রিমতা, ছন্দোবদ্ধ ও অলংকারের কোন নিদর্শন ছিল না; বরং এর মধ্যে স্বচ্ছ ও মুক্ত রচনাশৈলী পাওয়া যেত যা কোন ভাবার্থকে গোপন রাখত না এবং যাতে কোন আকার-ইঙ্গিত থাকত না। সুতরাং লেখকবৃন্দ যে বিষয়েই পরিচিত হতেন তাতে সন্দেহ পোষণ করতেন—উক্ত বিষয় যত কৌশলপূর্ণ ধর্মীয় রচনাশৈলীর দিক থেকেই হোক অথবা ছন্দোবদ্ধ ও অলংকার দ্বারা জটিল সাহিত্যের রচনাশৈলীর দিক হতেই হোক। অতএব তাঁরা সাহিত্য ও ধর্ম উভয় ক্ষেত্রে পুরাতন বর্ণনার পথ অন্বেষণ করলেন।[৩১]

তথ্যনির্দেশ

১ Cf. M.H. Bakalla, *Arabic Culture* (London : Kegan Paul International, 1984), P. 185 ; ড. শাওকী দায়ফ, **আল-আদব আল-আরবী আল-মু'আসির ফী মিসর** (কায়রো : দার আল-মা'আরিফ, ১৯৮৩), পৃ. ১২-১৮, ৪১-৫৭ ; আবদুস সাত্তার, **আধুনিক আরবী সাহিত্য** (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৪), পৃ. ৪৪-৪৫, ১০২

২ মুহাম্মদ জামাল আল-দীন আল-শায়্যাল, **তারীখ আল-তারজামা ওয়া আল-হারকাত আল-সাকাফিয়্যা ফী মিসর**, পৃ. ১৬ ; আবদুর রহমান আল-রাফিয়ী, **'আসর ইসমাইল**, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫ ; আবদুস সাত্তার, **আধুনিক আরবী সাহিত্য**, পৃ. ৪৪-৪৫, ১০২ ; ইয়াহ্ ইয়া আরমাজানী, **মধ্যপ্রাচ্য : অতীত ও বর্তমান**, মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৩৩২, ৩৩৯-৪১

৩ রেজাউল করীম, "আধুনিক আরবী সাহিত্য", **প্রবাসী** (কলিকাতা, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭), পৃ. ১৬১

৪ M.H. Bakalla, *Arabic Culture*, pp. 185-91 ; আবদুর রহমান আল-জাবারতী, **আজাইব আল আছার ফী আল-তাবাজিম ওয়া আল-আখবার**, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪ ; শাওকী দায়ফ, **আল-আদব আল-আরবী**, পৃ. ১৯-২৯ ; আবদুস সাত্তার, **আধুনিক আরবী সাহিত্য**, পৃ. ১২৭, ১২৯, ১৩১-৬৪

৫ আবদুস সাত্তার, **আধুনিক আরবী নাটক** (ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৭৬), পৃ. ৫-১১ ; **আরবী সাহিত্যের ইতিহাস**, ঐ, পৃ. ১৬৫

৬ শাওকী দায়ফ, **আল-আদাব আল-আরবী**, পৃ. ১১-১২

৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

৮ সৈয়দ ইহতিশাম আহ্মদ নদভী, **জাদীদ আরবী আদব কা ইরতিকা** (হায়দরাবাদ : চারকামান ন্যাশনাল ফাইন প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬৯), পৃ. ১১

৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

১০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

১১ শাওকী দয়ফ, **আল-আদব আল-আরবী**, পৃ. ১৩

১২ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩ ; সৈয়দ ইহতিশাম আহমদ, **জাদীদ আরবী-আদব**, পৃ. ১৩ ; Herold, J.C., *The Age of Napoleon*, Bonaparte in Egypt, (London, 1962), Pp. 80-85

১৩ সৈয়দ ইহতিশাম আহমদ, **জাদীদ আরবী-আদব**, পৃ. ১৪ ; শাওকী দয়ফ, পৃ. ১৪

১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩, ১৫, ৩১

১৬ শাওকী দয়ফ, **আল-আদব আল-আরবী**, পৃ. ৩২ ; আবদুর রহমান আল-রাফিয়ী, **তারীখ আল--হারকাত-আল-কাওমিয়্যাত ওয়া নিযাম আল-হুক্‌ম ফী মিসর**, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫

১৭ শাওকী দয়ফ, পৃ. ১৬ ; মুহাম্মদ জামাল আল-দীন আল-শায়্যাল, পৃ. ১৬

১৮ শাওকী দয়ফ, পৃ. ১৪-১৬ ; সৈয়দ ইহতিশাম নদভী, পৃ. ১৫-১৮

১৯ ইহতিশাম নদভী, পৃ. ১৮ , শাওকী দয়ফ, পৃ. ১৫-২৯

২০ ইহতিশাম নদভী, পৃ. ১৯-২১ ; ইব্রাহীম আবদুহ্‌, **তাতাউউর আল-সাহাফাত আল-মিসরিয়্যা**, পৃ. ২৩-২৭

২১ শাওকী দয়ফ, **আল-আদব আল-আরবী**, পৃ. ৩০-৩৭ ; ইহতিশাম নদভী, পৃ. ২১-২২

২২ ইহতিশাম নদভী, পৃ. ২৩-২৫ ; শাওকী দয়ফ, পৃ. ৩০-৩৭

২৩ শাওকী দয়ফ, **আল-আদব আল-আরবী**, পৃ. ২০৫-০৭ ; ইহতিশাম নদভী, পৃ. ২৬-২৮

২৪ ইহতিশাম নদভী, পৃ. ২৯-৩৩, al-Ashmawi, M. Z., "Arab Contribution to Literary Criticism", *Bulletin of the Faculty of Arts*, University of Alexandria, (Egypt, 1960), Vol. 14, Pp. 51-68 ; Muhammad Khalafallah, "Some Landmarks of Arab achievement in the field of Literary Criticism", *Bulletin of the Faculty of Arts*, University of Alexandria (Egypt, 1961), Vol. 15, Pp. 3–19

২৫ সৈয়দ ইহতিশাম আহমদ নদভী, পৃ. ৩৪-৪০ ; শাওকী দয়ফ, পৃ. ২০৮-২১২ ; আবদুস সাত্তার, পৃ. ১২২-১৬৪

২৬ ইহতিশাম নদভী, পৃ. ৩৮-৪০ ; শাওকী দয়ফ, পৃ. ২১২-২১৭ ; আবদুস সাত্তার, **আধুনিক আরবী সাহিত্য**, পৃ. ১৬৫-১৯৫ ; **আধুনিক আরবী নাটক**, ঐ, পৃ. ৫-১০

২৭ ইহতিশাম নদভী, পৃ. ৪১-৪২ ; শাওকী দয়ফ, পৃ. ৫৮-৬৯, ১৮৮-১৯৬

২৮ ইহতিশাম নদভী, পৃ. ৪৩-৪৫, উমর আল-দসূকী, ফী আল-আদব আল-হাদীস (১৯৪৮), পৃ. ৪০-৪৬

২৯ শাওকী দয়ফ, পৃ. ১৬৯

৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭২

৩১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২-১৮৮